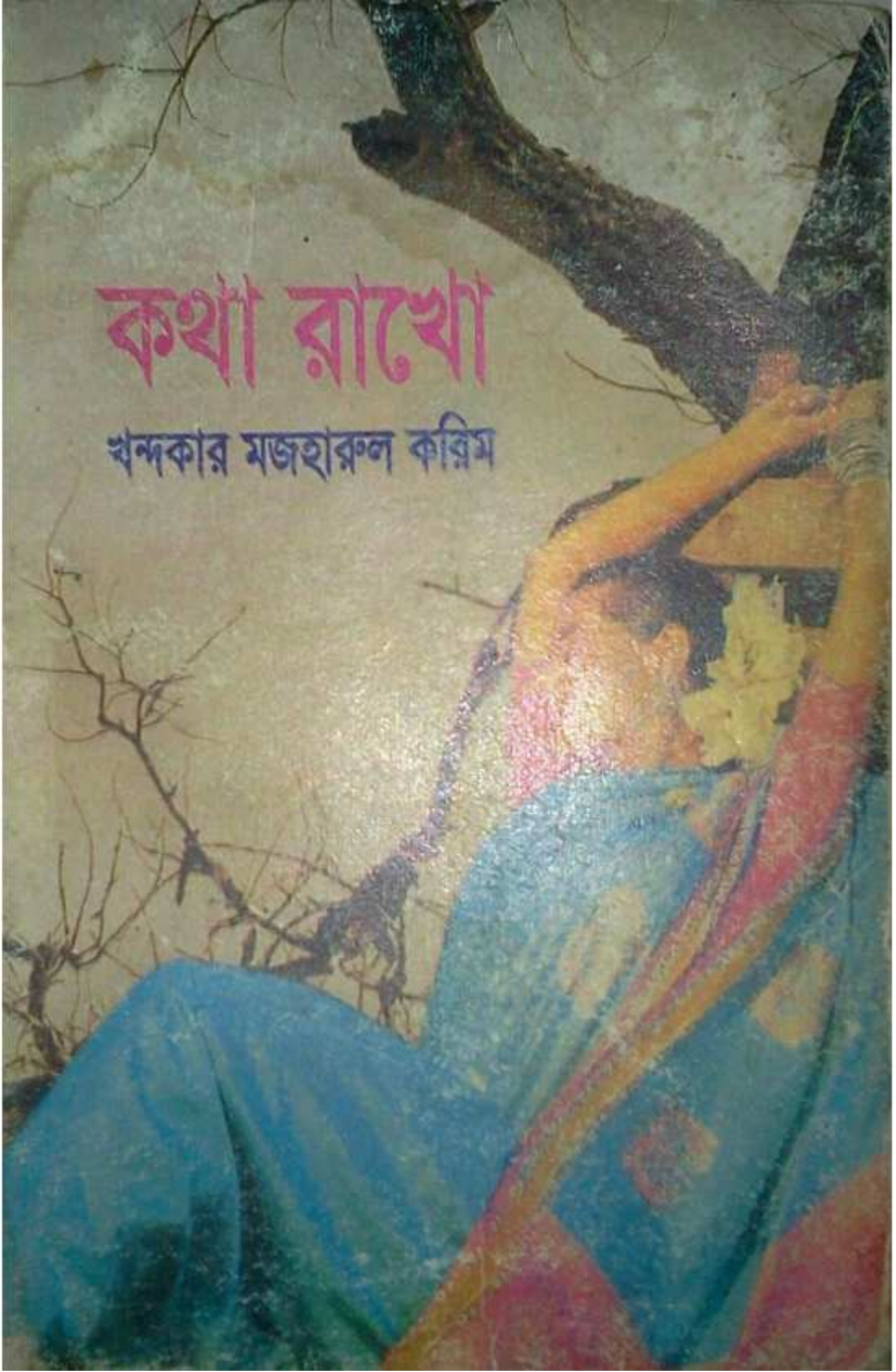
কথা রাখো
খন্দকার মজহারুল করিম

সেবা রোমান্টিক

কথা রাখো

খন্দকার মজহারুল করিম

কানিজকে সঙ্গ দিতে কেকা গিয়েছিল যশোরে,
জানত না, আসলে এক ঘোর বিপদ তার সঙ্গ চাইবে।
জানত না, ফারুকের বাড়ি একটি ফাঁদ,
আর একটি ফাঁদ হচ্ছে তার অতি সাধের প্রাচীন মূর্তি—
খুবই দামী, আইভরির তৈরি।
কিন্তু তার চেয়ে বড় ফাঁদ ফারুক নিজেই!
কেকা প্রথম থেকে সাবধান থাকতে চেয়েছে, পারেনি।
যখন বুঝল, পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই,
দেখল, দেরি হয়ে গেছে।
কেউ তাকে জটিল ফাঁদে ফেলেছে। কে এই ভিলেন?
আবেদা? ছন্দা ভাবী? না ফারুক নিজেই?
একজন ষড়যন্ত্রকারীকে কীভাবে ভালবাসবে কেকা?
কেকার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আসলে
আমাদের করার কিছু নেই। কী করা যায়, পাঠক? যাবেন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা রোমান্টিক

কথা রাখো

খন্দকার মজহারুল করিম

NAZIA

সেবা প্রকাশনী

চাচা—
খন্দকার আব্দুর রাজ্জাককে—
হাতে-খড়ির দিনগুলোর
অম্লান স্মৃতিতে—

SHARNALY

সংগ্রহ-(২৬)

এক

ঘুম ভাঙার আদর্শ সময় হচ্ছে সকাল সাতটা; অন্তত ফারুকের তা-ই বিশ্বাস। কিন্তু ঢাকা শহর জেগে ওঠে পাঁচটা কিংবা তারও আগে। মাছ-মাংসের ভ্যানগুলো বাজারে পৌঁছে যায়। বরফ ভাঙার ধুমধাম আর হকারদের হাঁকডাক শুনে বোঝা যায় আরও একটি দিনের শুরু হয়েছে।

ফারুকের ইচ্ছে ছিল আরও খানিকটা ঘুমোবে। আধো তন্দ্রা আর আধো জাগরণের মধ্যে সে একসময় টের পায়, দরজায় মৃদু টোকা পড়ছে। কেউ কাউকে ডাকছে। মিনিটখানেক পর সে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে বসে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে নাকি তার? এই ঘরে সে একা; তার মানে তাকেই ডাকছে কেউ।

এরপর চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে যায় পরীক্ষায়-ফেল-করা বাউণ্ডুলে ছেলে যেভাবে ঘর ছাড়ে সেইভাবে। দু-চোখের কোণে সাবধানে কনিষ্ঠা বুলিয়ে সাফ-সুতরো করে নেয় ফারুক। আড়চোখে তাকায় বিছানার পাশে এমনকি পায়ের দিকেও। আইভরির নারীমূর্তিটি নেই। সে বিষম দমে যায় মনে মনে। শুধু নারীমূর্তি কেন, ওয়ার্ডরোব কিংবা টিপয়টাও নেই। বিছানার পাশে একটা গোলাকার টেবিল, দরজা-জানালার পরদার সঙ্গে রঙ-মেলানো কাপড়ের কাভার। তার ওপর ক্যাসিও কোম্পানির কোয়ার্স টেবিল ঘড়ি— সাড়ে ছটা বাজে। ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে এই সময়ের আগেই জেগে ওঠে ঢাকা শহর। ইকবাল রোডে রিকশার ক্রিং

ক্রিং ঘন্টাধ্বনি আর আসাদ অ্যাভিনিউয়ের রেস্তোরাঁ থেকে বিচিত্র সব শব্দ আসে।

ঘড়ির পাশে কাচের জগটা দেখতে পেয়ে ফারুকের মনে হলো, বিষম তেষ্টা পেয়েছে। এই মুহূর্তে পানি না পেলে মরেই যাবে। গ্লাসে পানি ঢেলে এক নিঃশ্বাসে সে নিঃশেষ করল গ্লাস।

দরজায় আবার টোকার শব্দ। কেউ তাকে ডাকছে। কেন এই জ্বালাতন রাত না পোহাতেই? কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফেলে ফারুক মশারির প্রান্ত তুলে খাট থেকে নেমে পড়ে।

এটা তার যশোরের বাড়ি নয়।

যশোর শহর থেকে বেশ কিছু দূরে— সন্ধের পশ্চিমাকাশে সূর্যের আভা ফিকে হয়ে আসার মত যেখানে ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে শহর— সেখানে এক চমৎকার বাড়ি আছে ফারুকের। বাড়ি ঠিক ফারুকের নয়, তার পূর্বপুরুষের। এলাকাটা যখন সামন্তপ্রভুদের একচেটিয়া শাসনের মধ্যগগনে তখন কাজী ওয়াজেদ বাগানবাড়ির আদলে বানিয়েছিলেন ওই বাড়ি। তাঁর ছেলে কাজী জাহিদ সারা জীবন কাটিয়েছেন বিপ্লবী রাজনীতি আর কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করে; বাড়ির দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেননি। উত্তরাধিকার সূত্রে কাজী ফারুক এখন বাড়িটির মালিক। পুরানো জেল্লা ফিরে আসেনি পুরোপুরি— সেটা সম্ভব নয়, তা ছাড়া দরকারই বা কী? ফারুক তার ইচ্ছেমত সাজিয়ে নিয়েছে। আস্তাবল ভেঙে বড়সড় গ্যারাজ হয়েছে। ছাত্রজীবনের মোটর সাইকেল অচল হয়ে গেলেও সেটা ফেলে দেয়নি ফারুক। বছর দুই আগে কিনেছে একটা সুজুকি মোটরগাড়ি। সব আছে সেখানে।

বাগানবাড়ির নাচঘর ছিল খুবই বিখ্যাত। শোনা যায়, মাঝে মাঝে এখানে নাচের আসরের আয়োজন করা হত আর আমন্ত্রণ জানানো হত স্থানীয় ভুঁইয়া, রাজা-রাজড়া, এমনকি ইংরেজ শাসকদেরও। নাচঘর

ভেঙে তৈরি করেছে আধুনিক ড্রইংরুম, স্টাডি আর গেস্টহাউজ। যেমন-তেমন ঘর নয়, তিন রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট।

মূর্তির সংগ্রহ ছিল দেখার মত। বেশির ভাগ মূর্তি খোয়া গেছে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর। যেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল অবহেলায়, অযত্নে, সেগুলো সাধ্যমত সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে ফারুক। সবচেয়ে দামী, আইভরির তৈরি নারীমূর্তিটি রেখেছে নিজের ঘরে। মূর্তিটির ওপর তার দুর্বলতার একটা ইতিহাস আছে। সে-প্রসঙ্গ এখন থাক। এই মুহূর্তে আমাদের উচিত বর্তমানের ফারুকের কাছে ফিরে যাওয়া।

বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফারুক। এই বাড়ি তার বোনের। মরহুম কাজী ইসমাইল বেঁচে থাকতেই একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে যান ঢাকার সম্পন্ন বনেদি পরিবারের ছেলে করিম শাহনওয়াজ খানের সঙ্গে। মিসেস খান, মানে আইরিন, বয়সে যদিও ফারুকের চেয়ে সামান্যই বড়, তবু ছোটকাল থেকে ভাইটিকে শাসনে রাখতে কখনও ভুল করেনি। তার কড়া নির্দেশ: ঢাকায় এসে ফারুক কখনই হোটেল, রেস্টহাউজ কিংবা অন্য কারুর বাসায় উঠতে পারবে না। করিম শাহনওয়াজ খানও খুব পছন্দ করেন শ্যালককে। একবার ফারুক হোটেল শেরাটনে উঠেছে শুনে গাড়ি নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানে। নিজেই তার চেক আউটের ব্যবস্থা করে লাগিজ তুলেছিলেন গাড়ির ট্রাঙ্কে। রীতিমত অসন্তুষ্ট, এমনকি রুষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করেছে ফারুক; অভিযোগ করেছে, এটা তার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। কিন্তু খান সাহের হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। মোহম্মদপুরের ইকবাল রোডে বিরাট বাড়িতে থাকেন তাঁরা। ফারুক হোটেলে উঠবে কেন? ওইসব ইংরেজি কেতা বাঙালি আত্মীয়স্বজনকে দেখানোর দরকার নেই, তাঁর সাফ কথা। তা ছাড়া ইকবাল রোডে থাকতে জমিদার নন্দনের যদি অসুবিধে হয় তিনি তাঁর গুলশানের বাড়িও খালি করে দিতে

পারেন।

এরপর আর ঝামেলা পোহানোর মানে হয় না। ফারুক স্বাধীনতার আশা ছেড়ে দিয়ে বোন-দুলাভাইয়ের অধীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। লাভ হয়েছে দুটো। টাকার অপচয় বন্ধ হয়েছে, ভাল খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি যত্নটা ফাউ।

করিম শাহনওয়াজ খান একদিন ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'এরপরও যদি, শালা, তোমার এখানে অসুবিধে হয়, বলো কী করতে পারি। লোককে গার্লফ্রেণ্ড জুটিয়ে দেয়া আমার জন্যে একটুও কঠিন না। কিন্তু তোমার আশার চোখ দিয়ে যখন আগুনের হলকা ছুটবে, নাকের ছিদ্র বড় হয়ে যাবে, তখন...'

ফারুক তাড়াতাড়ি বলেছে, 'মাফ চাই, মাই রেসপেক্টেড বিশ্বকর্মা দুলাভাই। গার্লফ্রেণ্ডের দরকার নেই। আপনার মত ওয়েল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ফ্রেণ্ড থাকলেই জীবন ধন্য বলে মেনে নেব।'

খান সাহেব হো হো হেসেছেন, কিন্তু ছেড়ে দেননি। 'বয়স কত হলো তোমার? আইরিনের তো উনত্রিশ। তার মানে তোমার নিশ্চয় পঁচিশ বা ছাব্বিশ!'

'জ্বি না, সাতাশ।'

'ওই হলো। সাতাশ। এরই মধ্যে এঞ্জিন অকেজো করে ফেলেছ? অন্ত নারী অফার করছি, আর তুমি কিনা সিটিয়ে যাচ্ছ!'

ফারুক হেসে সারা। 'সত্যি কথা বলি, দুলাভাই, কাউকে মনে ধরে না।'

'মনে ধরে না মানে! সাড়ে ছ কোটি নারী আছে দেশে। ক'জনকে দেখেছ, শালা? ঢাকা শহরেই আছে চল্লিশ লাখ। অন্তত বারো লাখ কুমারী।'

'দুলাভাই, ওদের কেউই সেই রমণীর মত না। আমি তো দেখিনি।'

করিম শাহনওয়াজ খান অপলক চোখে এই খামখেয়ালী তরুণের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'ও, বুঝেছি। সেই মূর্তি কেস। আইরিন বলেছিল।'

'আপাকে বলেছিলাম ওই রকম মুখের কোন মেয়েকে দেখলে জানাতে। আপনার কাছে লাগিয়ে দেয়ার জন্যে তো বলিনি।'

'মাই ডিয়ার শ্যালক, এসব এখন বুঝবে না। আইভরিওয়ালীকে যদি কখনও খুঁজে পাও, বিয়ে তো করবে! তখন বুঝবে। এইরকম একটা ভুরভুরে রোম্যান্সের ব্যাপার···স্বামীর কাছে চেপে যাওয়া মুশকিল আছে।'

ফারুক কেটে পড়েছে। দুলাভাই কেমন মুখপাতলা লোক, বিলক্ষণ জানে সে। বেশি ঘাঁটানো বুদ্ধির কাজ নয়। খান সাহেব অবশ্য সমস্যাটা ভোলেননি। প্রায়ই জনারণ্যে 'আইভরিওয়ালী' খুঁজে বেড়ান। একবার কনস্ট্রাকশনের কাজ তদারক করতে গিয়েছিলেন রাজশাহীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রছাত্রী এসে আবদার জুড়ে দেয়, চ্যারিটি শো করার জন্য তাদের কিছু চাঁদা দিতে হবে। তখনও সমাজের সব স্তরে চাঁদাবাজী ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠেনি। খান সাহেব চাঁদা দিতে রাজি হলেন, কিন্তু সঙ্গে টাকা ছিল না। বললেন পরে যোগাযোগ করতে। হৃষ্ট মনে ফিরে যাচ্ছিল ছাত্রছাত্রীরা। দলের একটি মেয়েকে দেখে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠেন তিনি। চেহারাটি হুবহু সেই আইভরি মূর্তির মত। পরদিন দলটি আবার এসেছে চাঁদা নিতে। কিন্তু সেই মেয়েটিকে আর দেখতে পেলেন না খান সাহেব।

ম্যানেজার তাপস চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, স্যার, কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

উদাস স্বরে খান সাহেব বলেছেন, 'ফারুককে তো চেনো! আমার শালা। ওর জন্যে পাত্রী খুঁজছিলাম।'

তাপস উৎসাহী হয়ে ওঠে। 'স্যার, ওদের সবাইকে আমি চিনি। ঘটকালি করার দায়িত্ব যদি দেন...'

'কালকের সেই আইভরিওয়ালীকেও চেনো নাকি?'

'আইভরিওয়ালী মানে! এরাই তো কাল এসেছিল!'

খান সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কাজটি তাপসকে দিয়ে হবে না। চেষ্টা শুরু হলো। অনেক সময় আর শ্রম ব্যয় করার পর জানল, আইভরিওয়ালীটি ঠিক ছাত্রী ছিল না, প্রাক্তন ছাত্রী। বিবাহিতা। একটি বাচ্চাও আছে। যাক, একটা মিশন ফেল করেছে বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না করিম শাহনওয়াজ খান। তেমন হলে সামান্য অবস্থা থেকে কোটি টাকার মালিক হয়ে ঢাকা শহরে জাঁকিয়ে বসতে পারতেন না।

তিনি ধরলেন আইরিন-ফারুকের আত্মীয়া ছন্দা ভাবীকে। ছন্দা ভাবী দূরের কেউ নন, ওদেরই ফার্স্ট কাজিন সালামের বিধবা বউ। বছর কয়েক আগে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যান সালাম সাহেব। কাজী ইসমাইল যতদিন বেঁচে ছিলেন, সালামকে চোখের আড়াল হতে দেননি। লোকে বলে আপন সন্তানের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন ভাইয়ের ছেলেটাকে। আর সালামের চোখে চাচা ছিলেন 'ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড।' চাচার সম্পত্তি আর ব্যবসা দেখাশোনার কেউ ছিল না। সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে না গেল চাকরিতে, না করল ব্যবসা। চাচার এস্টেটের হাল ধরল।

তাতে অবশ্য ফারুকের কোন অসুবিধে ছিল না। উস্কানি দিয়ে হিংসে সৃষ্টি করার লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রকাণ্ড সম্পত্তির ঝুট-ঝামেলার দায়িত্ব কে নেবে? সালাম এগিয়ে আসাতে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল সে। কিন্তু সুখটা বেশিদিন টিকল না। দুটি নাবালক শিশু আর ছন্দাকে রেখে অসময়ে চলে গেলেন সালাম।

ছন্দা চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফারুক খোলাখুলি জানতে চেয়েছে নতুন করে সংসার গড়ার ইচ্ছে বা পরিকল্পনা আছে কি না তাঁর। ছন্দা ভাবী কেঁদে ভাসিয়েছেন।

'অমন কথা মুখে এনো না, ভাই লক্ষ্মণ। আমি এই ছেলেমেয়েদের নিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।'

'তা হলে চলে যেতে চাও কেন?'

ছন্দা বিব্রত স্বরে বলেছেন, 'তোমাদের যদি অসুবিধে হয়...'

'আমাদের কোন অসুবিধে নেই।'

ছন্দা ভাবীর দ্বিধা কাটেনি। 'লোকে পাঁচ কথা তুলতে পারে।'

'লোকে কথা তুলেই থাকে। তুমি যদি কোথাও একলা সংসার পাতো, তখনও তুলবে। তার চেয়ে ওসব চিন্তা বাদ দাও। তুমি আমাদের মানুষ। আমাদের সঙ্গেই থাকো সুখে-দুঃখে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। আমারও কোন অভিভাবক নেই।'

এরকম দাবির বিপরীতে কী ধরনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন ছন্দা? তিনি অশ্রুর ভাষায় মনের কথা জানিয়ে দিলেন। সেই থেকে ছন্দা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফারুকদের যশোরের বাড়িতে আছেন। খেত-খামারের জটিল ঝামেলার কিছুটা বরাবরই তাঁর কাঁধে ছিল। দিনদিন সে-ভার বেড়ে চলল।

তা বাড়ুক। কিন্তু তাই বলে আমরা নায়কের কাছ থেকে কথায় কথায় এত দূরে চলে আসব? চলুন ফিরে যাই করিম শাহনওয়াজ খানের গেস্টহাউজে। ফারুক হাই তুলতে তুলতে দরজা খুলল, তারপর ভুলে গেল নিঃশ্বাস নিতে।

বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন তরুণী। একজনের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। চোখে পুরু লেন্সের সরু চশমা। শরীরে তীক্ষ্ণতা আছে, চোখেও বুদ্ধির দীপ্তি, কিন্তু লাবণ্য নেই। পায়ের

কাছে দুটো সুটকেস। ফারুক আপন মনে হাসল। মেয়েরা স্যুট পরে না। ওদের বাক্সগুলোকে কী বলা যায়? শাড়িকেস? তরুণীর মুখে প্রথমে বিব্রতভাব ফুটে ওঠে। তারপর সেটা গড়ায় বিস্ময়ের দিকে। শেষ পর্যন্ত উচ্ছ্বাসের কাছে গিয়ে থামে।

'আপনি···কাজী ফারুক না?'

অন্যমনস্কভাবে ফারুক বলল, 'জ্বি।' তার দৃষ্টি থমকে গেছে দ্বিতীয় তরুণীর দিকে তাকিয়ে। যশোর থেকে উড়ে এসেছে হাতির দাঁতের মূর্তি। রক্ত-মাংসের একটি শরীরে ভর করেছে। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ।

দুই

একটু নার্ভাস দেখাচ্ছে আইভরিওয়ালীকে। তাকে জিজ্ঞেস না করেও ফারুক বুঝতে পারছে। এই বাড়িতে, বিশেষ করে এই কামরায় ফারুককে দেখবে ভাবেনি তারা। আর চশমাওয়ালী? মুখে একটা স্মার্ট স্মার্ট ভাব ঝুলিয়ে রাখলে কি হবে, সে নিজেও ঢোক গিলছে, কণ্ঠার দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।

কিন্তু ফারুকের একটা সুবিধে আছে, সে কখনও ঘাবড়ায় না। কিংবা হয়তো ঘাবড়ায়, টের পাওয়া যায় না। নিঃশব্দে গলা পরিষ্কার করে মেঘডাকার মত শব্দে সে বলল, 'ভিতরে আসেন।'

নিজের কাছেই অস্বাভাবিক ভারী মনে হলো স্বরটা। সাধারণত

নিজের বাড়িতে ফারুক কখনও একা থাকে না। তা ছাড়া এভাবে দরজায় নক করে তার ঘুম ভাঙাতে হলে বুকে কিছু বাড়তি পাটা দরকার। তাই দরজা খুলে ঘুম-জড়ানো গলায় কাউকে স্বাগত জানানোর অভিজ্ঞতা হয়নি তার।

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় ফারুক। প্রথমে চশমাওয়ালী, তারপর আইভরিওয়ালী ঘরে ঢোকে। তারা দু'জনেই যথেষ্ট ক্লান্ত। নিশ্চয় রাতের কোচে জার্নি করে এসেছে। এক ধরনের গুমোট গন্ধ আসছে তাদের পোশাক আর সুটকেস— মানে শাড়িকেস থেকে। ফারুক সিলিং ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দেয়।

'বসেন।'

একটানে মশারির কোণার বেল্টগুলো খুলে জানালার পরদা সরিয়ে দেয় ফারুক। চশমাওয়ালী ঈজি চেয়ারে বসে। আইভরিওয়ালী তখনও দাঁড়িয়ে। নিজের ভুল বুঝতে পারে ফারুক। বিড়বিড় করে 'সরি' বলে সে চলে যায় পাশের ঘরে। বেতের চেয়ার এনে এগিয়ে দেয় দণ্ডায়মানার দিকে।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের চিনতে পারিনি।'

'আমার নাম আবেদা আলমগীর খান। করিম আমার দেবর, মানে আমার স্বামী হাসান আলমগীর খানের চাচাত ভাই। আমরা রাজশাহীতে থাকি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল করিমের বিয়ের সময়।'

ফারুকের মনে পড়ল। আইরিনের সঙ্গে করিমের বিয়েতে প্রচুর ধুমধাম হয়েছিল। ইক্সেপশনাল বিয়ে। একটানা সাতদিন ধরে অনুষ্ঠান চলেছে। কয়েকশো আত্মীয় আর কয়েক হাজার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে পরিচয় বিনিময় হয়েছে দু'পক্ষে। সবার কথা মনে রাখা কঠিন। তবু ফারুকের মনে হলো, এই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আবেদা ওর

পরনের শার্টটা দেখে বলে দিয়েছিল, কাপড়টা ফ্রান্সে তৈরি। একশো বছরের পুরানো বোতাম।

কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। প্রত্নতত্ত্ববিদের চেয়ে প্রত্ন বিষয়েই এখন বেশি আগ্রহী ফারুক। শুধু আগ্রহী বললে কম হয়, সে রীতিমত ব্যস্ত আর ব্যগ্র। কিন্তু সমস্যা তার সঙ্গিনীকে নিয়ে— যে কেবল নিজের বিশদ পরিচয় প্রকাশের জন্য অস্থির। এর পর তার সঙ্গে একটু রূঢ় আচরণ করতেই হয়। ফারুক যেন আবেদার কথা শুনতেই পাচ্ছে না এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল আইভরিওয়ালীর দিকে।

লক্ষ করে আবেদাও মুখ ঘোরায় সঙ্গিনীর দিকে। 'ও, এর পরিচয় দেয়া হয়নি। এর নাম কেকা। কেকা শাহীন। আমার খালাত বোন। পাবনায় থাকে। এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স পাস করেছে। মেধাবী ছাত্রী। গান গায়। প্রত্যেকদিন দু'চারটে করে বিয়ের প্রস্তাব আসে। খালা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ঘটকদের ভিড় সামলাতে গিয়ে। শেষে আমার সঙ্গে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। আমারও একটু সাহায্য হবে, খালাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন, এই আর কি।'

ওই অন্বিষ্ট মুখ সম্পর্কে না হয়ে অন্য যে-কোন বিষয়ে হলে মিসেস আবেদা আলমগীর খানের দীর্ঘ একঘেঁয়ে বক্তৃতায় ফারুকের মাথা ধরে যেত। এরকম একটানা কথা বলা সম্ভব, ফারুক আগে জানত না।

ফারুক গম্ভীর স্বরে বলল, 'হুঁ, তার মানে আপনি জরুরী কাজে এসেছেন ঢাকায়! দেবরের বাড়ি বেড়াতে আসেননি।'

দু'হাত উল্টে অদ্ভুত ভঙ্গি করল আবেদা। ছোট ছোট মেয়েরা ঠিক ওইভাবে গুটি খেলা করে। 'হ্যাঁ···মানে···না, ঠিক তাও নয়। আসলে আমি এসেছি একটা গবেষণার কাজে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা। এম. ফিল. করব। ডক্টরেটও হয়তো করে ফেলব, আল্লাহ চাইলে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকব। ওই যে কী যেন নাম···

কামরুন্নাহার হল...'

'কামরুন্নাহার না, শামসুন্নাহার হল।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের অ্যান্টিকস্‌তুল্য দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। সেগুলো ঠিক কালো নয়, কিন্তু সাদাও বলবে না কেউ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাব— মানে সেই ঐতিহাসিক বড়কুঠির রং ধরেছে দাঁতগুলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাই, ঠিক বলেছেন। শামসুন্নাহার হল। ওখানেই থাকব, কথা ছিল। কিন্তু হাসান বলল, "কি দরকার, করিমের প্যালিস পড়ে আছে। তুমি অসহায়া ছাত্রীদের মত হোস্টেলে কষ্ট করতে যাবে কেন?" তো...ভাবলাম, হাসান ঠিকই বলেছে। করিম নিশ্চয় খুশি হবে।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল ফারুক— গোবেচারার মত। গোবেচারা? না, উপমা ঠিক হলো না বোধহয়। ফারুক জানতে পেলে বিষম মাইণ্ড করবে। অথবা দম-ফাটা হাসি ছাড়বে। ছেলেবেলায় একবার এক রাগী গরু এমন তাড়া করেছিল যে সার্কিট হাউজ রোড থেকে ছিটকে জেলা স্কুলের পুকুরে লাফ দিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করতে হয়েছিল তাকে। তাতেও কি গরুর রাগ মেটে? পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে শিং ওঁচাচ্ছিল। একবার সুযোগ পেলে হয়, ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। গরু সে-সুযোগ আর পায়নি, কিন্তু ফারুকেরও আর কখনও হয়ে ওঠেনি সেই আতঙ্কের স্মৃতি ভুলে যাওয়া।

ফারুক চোখ তুলে আইভরিওয়ালীর দিকে তাকাল। কতকটা আনমনা সুরে বলল, 'আমিও খুশি হয়েছি।'

প্রত্নতত্ত্ববিদ কাঁধ ঘুরিয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল। 'খুশি হবে না? তুমি তো জানো না, কেকা, কী যে মজার লোক এই কাজী ফারুক সাহেব! করিমের বিয়ের দিনে একটা মহা ঢিলা প্যান্ট পরে ছিলেন! তার ওপর চড়িয়েছেন ফতুয়া। কী যে হাসিয়েছিলেন...'

অবাক হয় ফারুক। মহিলা এত মিছে কথা বলতে পারে! কার না কার সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলেছে। সে কখনও অমন সঙের সাজ পরেনি! কিন্তু এই বিষয়ে তাকে আর কথা বলতে দেওয়া যায় না। যে খুব বেশি কথা বলে, কিছু মিথ্যে তার মুখ থেকে বেরুবেই।

ফারুক কাট-ইন করে বলল, 'আপনার নাম অতি সুন্দর। আপনি নিজে অবশ্য নামটার চেয়েও সুন্দর!'

কেকা নিজের ভিতর সেঁধিয়ে যায় প্রায়। সরাসরি রূপের এমন প্রশংসা শোনা তার কখনও হয়ে ওঠেনি। ছোট শহরে থাকে সে। সেখানে মানুষের কথাবার্তা খুবই ঘরোয়া, ইনফর্মাল। কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েশনের চলটাও নেই। কেকা শরীরের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দেয় বেতের চেয়ারে; যেন সে নিজে ছাড়ছে না, চেয়ারই সানন্দে আদায় করে নিচ্ছে তার লঘু, পেলব শরীরের ভার।

সে কি সত্যি রূপসী? আয়নাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছে, উত্তর পায়নি। সে তার ছোট-খাট কিশোরীসুলভ মুখে কোন তরুণহৃদয়মোহন শ্রী খুঁজে পায় না। বরং বয়সে অনেক বড় হলেও তার 'আবেদা আপাকে' ঢের বেশি সুন্দর মনে হয়। আবেদার বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে। একটা বাচ্চাও হয়েছিল, অর্ধমৃত। হাসপাতাল থেকে বাসায় আনার পথেই মারা যায়। কিন্তু তাকে দেখে কে তা বুঝবে? তার টানটান শরীর আর চঞ্চল চোখের তারা দেখে পুরুষরা প্রায়ই ভুল করে। ভাবে, তার বিয়েই হয়নি।

ফারুক কথাটা বলেছে সোজাসুজি কেকার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আবেদা কেন এমন ভুল করল, সে বা কেকা— কেউই বুঝে উঠতে পারছে না। সমস্ত শরীরে মায়াবী হিল্লোল তুলে হেসে ফেলল আবেদা। 'আমি সুন্দর! তবেই তো হয়েছে! হাসান কী বলে, জানেন? আমি নাকি ঠিক মোমবাতির মত। আপনার মত দেখার চোখ থাকলে তবেই না…'

কী বলতে পারে ফারুক? না, আমি আপনাকে সুন্দর বলিনি? আমার সুন্দর ওই এসে দাঁড়িয়েছে হেমন্তের ভোরে? আমি যার অপেক্ষায় ছিলাম যুগ যুগ ধরে, কার্তিকের একটি প্রসন্ন প্রভাত হয়ে সে নিজেই এসেছে?

এসব ওই আধা-অপ্রকৃতিস্থা প্রত্নতত্ত্ববিদকে বলা যায় না। মৃদু হাসল ফারুক। কেকা লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে। এখন সে বিষম বিব্রত। একমুখ হাসি নিয়ে কার দিকে তাকাবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে যা-ই হোক, এই মুহূর্তে মহীরুহের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ওই পুরুষের স্তবের মুখে বুকের নদীতে যে অকাল জোয়ার এসেছিল, সেটা দ্রুত মিলিয়ে গেল। আবেদ আপা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে।

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ফারুক। ওকে দেখে রাশভারী মনে হতে পারে। কিন্তু তরুণী দু'জন সবিস্ময়ে দেখে, তার চলাফেরার কোন শব্দ অন্যের কানে যায় না। ঠিক যেন পা টিপে টিপে, সন্তর্পণে হাঁটছে। অথচ তাকিয়ে দেখো, পুরোপুরি স্বাভাবিক হাঁটা, নড়াচড়া তার। একটা উপমার কথা হঠাৎ মনে পড়ে কেকার। সাউণ্ড অফ্ রেখে টেলিভিশনে মানুষের হাঁটাচলা দেখতে যেমন লাগে ঠিক তেমনই।

মুখ হাঁ করে হাই তুলল আবেদা। বুক থেকে আঁচল খসে গেছে কখন, খেয়াল করেনি। কেকা আবেদার কাছে সরে এসে সেটা ঠিক করে দিল। 'ঘুম পাচ্ছে, আবেদা আপা?'

কী যেন ছিল কেকার কথার সুরে। চাপা হাসি? কৌতুক? আবেদা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করে বলল, 'তুমি তো সীটের ব্যাক নামিয়ে মহা আরামে ঘুম দিয়েছ। নদী পার হবার সময় এত ডাকলাম, তোমার আর খবর নেই!'

'তুমি ঘুমোলে না কেন? হাসান ভাইয়ের কথা মনে পড়ছিল বুঝি!'

আবেদা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'গোসল করা দরকার। ওটাই বোধহয়

বাথরুম, তাই না?'

কেকা হাসল। 'তোমার আত্মীয়র বাড়ি। আমি কী করে জানব? আসলে তোমার মাথার ঠিক নেই। কী আর করবে, বলো? মোটে তো এক মাসের বিরহ। তা ছাড়া ঝামেলা কমলে হাসান ভাই হুট করে এসে পড়তেও পারেন।'

'এই মেয়ে, থামবে তুমি? খুব টীজ করা হচ্ছে, না?'

ফারুক ফিরে এসেছে। 'আপনাদের শুভাগমনের খবর দিয়ে এসেছি আইরিন আর করিম খান সাহেবকে। করিম সাহেব তো আবার বিলাসী মানুষ! আমার চেয়েও। রাতে ক্লাব থেকে ফেরে বারোটা কিংবা একটায়। তিনটের দিকে ঘুমোয়। নটা-দশটার আগে ওর দেখা পাওয়া কঠিন হবে। আইরিন উঠেছে। এখনই আসবে। আপনারা শাওয়ারটা সেরে নিতে পারেন।'

'ওইটাই বুঝি বাথরুম!'

'ওটা ব্যবহার করতে পারেন। তবে পাশে আরও দুটো রুম আছে, সব রুমের সঙ্গেই বাথরুম লাগানো। আসেন, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

আবেদা ব্যাগ-সুটকেসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে বাধা পেল। সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে কখন যেন ঘরে ঢুকেছে। মালপত্র তুলে নিয়ে রওনা হয়েছে পাশের ঘরে। ফারুকের ইঙ্গিতে ছেলেটিকে অনুসরণ করে তারা। ঘর পেরুবার আগে ফারুকের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে ভুলল না আবেদা। শুধুই মেয়েলি কৌতূহল?

কেকা তার পিঠে চিমটি কাটে। মানে বুঝতে অবশ্য আবেদার দেরি হয় না। ফারুকের দিকে আড়চোখে তাকায় সে। ফারুক পিছন থেকে কেকার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবেদা পাশের বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। হঠাৎ কেন যেন হাসানের কথা মনে হয়।

তারপর বিরক্ত হয়ে ওঠে নিজের ওপর। সে কি সত্যি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার কাজে এসেছে? বিরক্তিকর দাম্পত্য থেকে পালিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার কোন গোপন সাধ কি তার ছিল না? খুব সম্ভব মানুষ এই কথা বোঝে না যে অনেক কথা সে নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখে।

'ঘর পছন্দ হয়েছে?'

কেকা চমকে ফারুকের দিকে তাকায়। ফারুক যে এতক্ষণ পলকহীন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল— এইরকম একটা আবছা সন্দেহ জাগলেও পাত্তা দিচ্ছিল না। কিন্তু এবার নিশ্চিত হয় সে। ফারুক তার দিকে তাকিয়ে আছে বললে কম বলা হয়। সে আসলে মেডিক্‌ল্ কলেজের উৎসাহী ছাত্রের মত মুখস্থ করছে কেকার কাব্যময় দেহরেখার ডায়াগ্রাম। কেকার ভিতর শান্ত নদীর বুকে ঢিল পড়ে। একটি মৃদু, অথচ তীক্ষ্ণ তরঙ্গ ছন্দ তুলে নাচতে নাচতে কোথায় যেন দিক হারায়। নিজের মনের ওপর পুরোপুরি দখলিস্বত্ব কায়েম হয়নি তার। দুটো ছোটখাট গোলমাল হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অবশ্য টের পেতে দেরি হয়নি যে ওগুলো ক্র্যাশ। প্রেম নয়। প্রেম কি এত সহজ?

বাধো-বাধো স্বরে কেকা বলল, 'ক'দিন আর থাকব?'

গম্ভীর গলায় মন্তব্য শুনতে পেল কেকা। 'কেউ জানে না শেষ পর্যন্ত মানুষের ঘর কোথায়।'

উত্তর না দিয়ে ঢোক গিলল কেকা। মৃদু তরঙ্গ ঢেউয়ে রূপ নিচ্ছে। কি সাংঘাতিক কথা! এই জন্যই কি সে আবেদা আপার সঙ্গে আসতে চায়নি? বাধা দিয়েছিল তার অবচেতন মন?

তিন

ডাইনিং রুম নিচের তলায়। ঘণ্টাখানেক পর সেখানে পৌঁছে কেকা দেখতে পায়, সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছে। ফারুকের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে প্লেট টেনে নেয়। করিম শাহনওয়াজ খান তার প্লেটে পরোটা আর মুরগির মাংস তুলে দেন। আবেদার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী খবর? হঠাৎ চলে এলে যে!'

'হ্যাঁ, হঠাৎই আসতে হলো।'

আইরিন হাসছে। 'বা রে! ভাইয়ের বাসায় আসতে হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অনুমতি নেবার দরকার হয় নাকি?'

আবেদার উত্তর দিতে একটু দেরি হয়। তার মুখভর্তি খাবার। 'হাসানকে...বলেছিলাম টেলিফোনে তোমার সঙ্গে...কথা বলতে। সময় পায়নি।'

'আশ্চর্য! গবেষণা করবে তুমি আর কথা বলার দায়িত্ব শুধু হাসানের?'

ফারুক লক্ষ করে, আবেদা অন্যত্র যতই বাচাল হোক, করিমের সামনে বেশ সংযমের সঙ্গে কথা বলে। সে আবেদার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আইভরিওয়ালীর দিকে মেলে দেয়। ঠিক সামনে বসে আছে তার ধ্যানের প্রতিমা। হতে পারে সত্যি সে কোন তরুণের ধ্যান রাজ্যের একচ্ছত্র রানী, হতে পারে কোন পুরুষের উতরোল স্বপ্নমিছিলের প্রতিমা। কিন্তু ফারুক তো শেষ পর্যন্ত তার দেখা পেয়েছে!

ফারুক দৃষ্টি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, পারছে না। সহজ ব্যাপার নয় পারা। ঠিক ওই মুখ, তনুরেখা, চাহনি আর চলন তার বুকের গভীর কোণে বাজছে বছরের পর বছর। স্বপ্নসহচরীকে এভাবে হঠাৎ সামনে পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া খুব কষ্টের কাজ।

করিম সাহেব বললেন, 'তোমার গবেষণার কথা বলো, আবেদা। সুপারভাইজার কে? তত্ত্বাবধান কে করবেন?'

আবেদা আপেলে কামড় বসাল। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করব আগে। ডক্টর কামার ফরিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সম্ভবত কোন একটা পুরানো বাড়িটাড়িতে গিয়ে...'

ফারুক লক্ষ করে, খাওয়া বন্ধ করেছে আবেদা। তার মানে এখনই ইন্টারসিটি ট্রেন ছুটতে শুরু করবে। তাড়াতাড়ি কথার মধ্যে ঢুকে পড়া দরকার। কিন্তু তার আগেই কেসটা টেক আপ করলেন করিম খান।

'আমাদের বাড়ির ভিতর সবচেয়ে পুরানো এলাকা সামনের বারান্দা। সাড়ে চার বছর কিংবা তারও কয়েকদিন আগে তৈরি করা হয়েছিল। বাকি কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছে এর পর।'

চাপা হাসি উঠল ডাইনিং টেবিলে। সবেমাত্র ফলের রসের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে আইরিন। অল্পের জন্য বিষম খাওয়ার হাত এড়াল। করিম খানের কাঁধে রামচিমটি বসিয়ে বলল, 'তুমি না...একটা...ইয়ে। সারারাত জেগে জার্নি করে বেচারি এইমাত্র পৌঁছল। তুমি কোথায় ওদের কামফর্টের দিকে খেয়াল করবে, তা না...'

গোবেচারা ভঙ্গিতে করিম খান বললেন, 'আমি আবার ওদের ডিসকামফর্টের কী করলাম? হাসাতে চেষ্টা করছি। সেটাই কামফর্টের ব্যাপার নয়? তুমি কী বলো, শ্যালক সাহেব?'

ফারুক গম্ভীর স্বরে বলল, 'দুলাভাইয়ের বাড়িটা নতুন হলে কি হবে, আমার বাড়ি কিন্তু সত্যি পুরানো। দেড়শো বছর আগের লাইব্রেরি

আছে। মুঘল আমলের মুদ্রা আর যুদ্ধের সরঞ্জামও পাওয়া যাবে। কেস স্টাডি হিসেবে যদি ব্যবহার করতে চান আমার আপত্তি নেই।'

হাসির হররা চলছিল, ডাইনিং টেবিলের চারপাশে শরীরগুলোও দুলছিল। হঠাৎ পুরো দৃশ্য ক্যানভাসে আঁকা ছবির মত হয়ে যায়। যেন তাক-লাগানো নয়, আস্ত একটা অয়েল পেইন্টিং লাগানো কথা বলেছে ফারুক।

করিম খানের কথায় হাসবে, নাকি হাসাটা উচিত হবে না— ভেবে পাচ্ছিল না আবেদা। কিন্তু ফারুকের কথা শুনে গম্ভীর হতেই হয়। অনেক চিন্তার খোরাক আছে প্রস্তাবের ভিতর।

কেস স্টাডির জন্য একটা পুরানো বাড়ি খুঁজে বার করার কথা তারই। রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়মের ডাইরেকটর আর এশিয়া ফাউণ্ডেশনের রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর— দু'জনেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে আছে আবেদা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক কাজ শেষ হবার পর আসল পর্যায়ে যখন ভুতুড়ে বাড়ি খুঁজে বার করতে হবে তখন কে সাহায্য করবে? কেকাকে তো সঙ্গে এনেছে শুধু অবসরে সঙ্গ দেবার জন্য। ওইসব ঝামেলার কাজে সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসবে?

করিম খান তীক্ষ্ণ চোখে আবেদার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছেন। আইরিন বলল, 'আপনাকে কফি দেব? না ফলের রস?'

আবেদা বলল, 'আগে ফলের রস।'

'তোমাকে আগে কী দেব, কেকা?'

প্রচণ্ড আঁচে পুড়ে যাবার আগে কাগজ যেমন লাল হয়ে ওঠে কেকার মুখের অবস্থা অনেকটা ওইরকম দাঁড়াল। আইরিন শাহনওয়াজ খান কি কথাটা সত্যি-মীন করেছেন? ভেবে পায় না কেকা। সে ন্যাপকিনে মুখ মুছে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। আবেদা মাঝে মাঝে বড় ঝামেলা

করে। খাওয়ার ব্যাপারে এতটা দুর্বলতা মেয়েদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে মিসেস খান ওইভাবে টীজ করবেন?

কেকা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমার কোনটাই দরকার নেই।'

করিম খান মিটিমিটি হাসছেন। গলা নামিয়ে আইরিন বলল, 'এই যে, লক্ষ্মী মেয়ে, আবেদা দুটোই নেবে বলে তুমি সবগুলো সারেণ্ডার করবে— সে আবার কেমন কথা? অনেকেই চা-কফির আগে বা পরে ফলের রস খেতে পছন্দ করে। আমরা আসলে যে-কোন একটা বেছে নিতে বলিনি।'

'না না, সেজন্য নয়।'

ফারুক মৃদু গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনার কফি দরকার। রাত জেগে ভগ্নিকে সঙ্গ দিয়েছেন। সকালের নাশতার পর এককাপ কফি খেয়েই দেখেন!'

কথাগুলো আদেশের মত শোনাল, কিন্তু কেন যেন কেকার মনে হলো তার মধ্যে অনুরোধ গা ঢাকা দিয়ে আছে। ঠিক এইরকম আদেশের ছদ্মবেশে অনুরোধ কি কেউ তাকে করেছে? কখনও না।

কেকার হাত আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ফারুক একটা কাপ টেনে নিয়ে পট থেকে কফি ঢালে। অভ্যস্ত, সাবলীল হাত। কেকা সবার চোখ লক্ষ করে আড়াল খুঁজে নেয়, তারপর আড়চোখে তাকিয়ে দেখে ফারুকের কফি বানানো।

আবেদা অন্যমনস্কভাবে ফলের রসে চুমুক দিতে দিতে করিম খানকে বলছে তার গবেষণার বিষয়। তার টার্গেট অবশ্য ফারুক। কথাগুলো ফারুকেরই জানা দরকার সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু ফারুকের অবকাশ কোথায়? সে নিবিষ্ট হয়ে আছে তার গবেষণায়। ডাইনিং টেবিলে ঠিক তার মুখোমুখি যে মায়াবী মূর্তিটি নারীর অবয়ব নিয়ে নড়াচড়া করছে, ফারুক তার সঙ্গে মেলাচ্ছে তার

স্বপ্নে-দেখা প্রতিমা। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এতটা মিল সত্যি চমকে দেবার মত। বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে, কোনটা আগে তৈরি হয়েছে? তার স্বপ্নের মুখ, না এই নারীর বাস্তব, জীবন্ত প্রতিমূর্তি? শুধু মুখ নয়, ওই ঋজু চুলের অন্ধকার-করা সমাবেশ, ভাস্বর-বাঞ্ময় চোখে কী-যেন-খুঁজে বেড়ানো, ওই বিউটি বোন, কাঁধের কাছে হঠাৎ পিছলে-নেমে আসা বাহু···সব যেন আগে দেখেছে ফারুক। যশোরের বাড়িতে সে যে-মূর্তি সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে তাতে এত ডিটেইলস নেই। ওর স্বপ্নসহচরীর তনুরেখার এত বিশদ দৃশ্য কোথেকে এসে মনে বাসা বেঁধেছে, কে জানে? তার চেয়েও রহস্যের ইশারা দিয়েছে দুই ছবির মধ্যে এত মিল।

ফারুকের রক্তস্রোতে একটি গান আবছা শৈবালের মত ভাসে। গানের কথাগুলো ঠিক মনে করতে পারে না। অনেক কষ্টে দুটো লাইন উদ্ধার করা গেল স্মৃতির গভীর তলদেশ থেকে। রবি ঠাকুরের গান।

'তুমি সুন্দর, যৌবনঘন, রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব অপচয় পরিপূর্তি।'

এই সময় একটি দিনের কথা ফারুকের মনে পড়ে যায়। ভাবনা বিলাসের সময় নেই; ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ হয়ে যাবে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে। তবু ভাবনার ভার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলা কি এতই সহজ?

ভোর রাতে ফারুকের ঘুম ভেঙেছে সেদিন। বেড়াতে বেরিয়েছিল। টাটকা হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে বাসায় ফিরে মনে হলো, রাতের ঘুম পুরো হয়নি। বিছানায় আরও একটু গড়িয়ে নিলে কেমন হয়? খারাপ হলো না। শুতে না শুতেই তন্দ্রা এসে ভর করল। এল স্বপ্ন মিছিল।

সে কাঙ্ক্ষিতার দেখা পেয়েছে। ট্রেনের নিরালা কামরায় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ। সেই মুখ, সেই অবয়ব। উদার চুলের অরণ্যে সেই আদিমতা, বুকের উচ্ছ্বাসে অনেক দিনের মায়াঘোর। স্বপ্নকন্যার সঙ্গে

আলাপ হয়ে যায়। সে-আলাপ প্রতিশ্রুতির দোরগোড়ায় পৌঁছনোর আগেই ছিন্নভিন্ন হয় হঠাৎ জাগরণে। কিন্তু দুঃখবোধ মাথাচাড়া দেবার সময় পায়নি। আসলে ফারুকের ঘুম ভাঙে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রিয় গান শুনে। কয়েকদিন আগে ছন্দা ভাবীকে এই চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছে ফারুক, মিক্যানিজমও শিখিয়ে দিয়েছে।

ছন্দা ভাবী ফারুকের পছন্দাপছন্দের খবর রাখেন। ভোরবেলা কোন গান শুনে তার মনটা চাঙ্গা হবে, জানতে বাকি নেই তাঁর। ফারুক চোখ কচলে ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল, ট্র্যান্সপারেন্ট প্লাস্টিক শিটের কাভারের নিচে প্রসন্ন ছন্দে ঘুরছে ছন্দার চাপিয়ে দেওয়া লং প্লেইং রেকর্ড। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাইছেন:

'যা কিছু চেয়েছ তাই যদি পাও ফুরাবে যে চাওয়া, জানো না কি?
পথের শেষ যে ঘরকে পেলে, কিছু চাওয়া থাক বাকি।...'

শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায় ফারুক। স্বপ্নকন্যার কথা মনে পড়ে। চাইলেই সবকিছু পেতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। কিছু চাওয়া বাকি থাকতেই পারে। সন্দেহ কি, প্রাচীন মূর্তি তার মনে একধরনের অবসেশন তৈরি করে রেখেছে। কাটানো দরকার। ফারুক মনে মনে তৎপর হয়ে ওঠে।

এরপর অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। ফারুকের চেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে বলা মুশকিল। কিন্তু আজ আবার নতুন মাত্রার অবসেশন নিয়ে রক্ত-মাংসের যে মানবী তার ঠিক সামনে উপস্থিত, সেটা কাটানোর কী হবে? নাকি, কাটানোর চেষ্টা করারই দরকার নেই?

আবেদা ফলের রস কয়েক চুমুকে শেষ করে কফি পটের দিকে হাত বাড়াল। করিম শাহনওয়াজ খান কফিমেট, দুধ আর চিনির পাত্রগুলো একে একে বাড়িয়ে ধরলেন। আবেদা অবশ্য কেবল খাওয়ার কথাই ভাবছে না, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে তার গবেষণার।

'আমার ভয় হচ্ছে, কেস স্টাডিতে সমস্যায় পড়তে হবে। লোকেশন কোথায় হবে, সেখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কি না, পাওয়া গেলেও হাসান আমাদের সেখানে যেতে দেবে কি না— এসব সমস্যা আছে। নতুন সমস্যা কেকাকে নিয়ে। ও তো প্রথমে আমার সঙ্গে আসতে রাজি হয়নি। অনেক বলে-কয়ে, পটিয়ে-পাটিয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যদি উপযুক্ত জায়গা না পাওয়া যায়...'

কফির কাপে চুমুক দিল আবেদা।

আইরিন বলল, 'কেন, ফারুক যে বলল, যশোরে আমাদের বাড়িতে দিব্যি আরামে থাকতে পারেন আপনারা!'

করিম খানের কপালে যে ভাঁজগুলো পড়েছিল আবেদার কথা শুনতে শুনতে, সেগুলো মিলিয়ে যায়। 'আরে, তাই তো! এদিকটা তো আমারও মাথায় আসেনি। আমার শ্যালক সাহেব হোস্ট হিসেবে খারাপ না। তা ছাড়া গবেষণার জন্যে ওদের বাড়ি এক্সলেন্ট। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ আছে ওর। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। বাড়িটাও তো ঐতিহাসিক। কী বলো, শ্যালক সাহেব?'

শ্যালকের কানে কথাগুলো পৌঁছেছে কি না বোঝা গেল না। করিম সাহেব বললেন, 'তুমি এক কাজ করতে পারো। ঢাকায় তো তোমার বেশি কাজ নেই। এই সময়ের মধ্যে যদি ওদের কাজও সারা হয়ে যায়, সবাই একসঙ্গে যশোরে চলে যেতে পারো। আমাদের নতুন মাইক্রোবাসটা...'

স্ত্রীর চিমটি খেয়ে চোখ কোঁচকালেন করিম শাহনওয়াজ খান। আইরিনের মুখে রহস্যময় চাপা হাসি। আবেদা একবার কেকা আর একবার ফারুকের দিকে তাকিয়ে বিরস মুখে কফির কাপে মন দিয়েছে। করিম খান ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারেন, ফারুক পৃথিবী ভুলে কেকার দিকে তাকিয়ে আছে। কেকাও বোধহয় পৃথিবী ভুলে আপনমনে

নাড়াচাড়া করছে শূন্য গ্লাস-প্লেট-কাঁটা-চামচ।

সেই সময় হঠাৎ বিদ্যুতের শক খাওয়ার মত কেঁপে ওঠেন করিম খান। কেকার দিকে তাকিয়ে আগে একবার মনে হয়েছিল, চেহারাটা চেনা চেনা লাগছে। এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি অর্ধোস্ফুট স্বরে বললেন, 'আইভরিওয়ালী!'

•

চার

কোন শারদ পূর্ণিমায় একেবারে একা নির্জন বনে চাঁদ দেখতে গিয়েছেন? বিশেষ করে রাত দ্বিপ্রহরে কিংবা শেষরাতে? কখনও যদি ওই অভিজ্ঞতা আপনার না হয়ে থাকে, পাঠক, আপনাকে অনুরোধ করব জীবনের অমন একটা স্বাদ লাভ করার আগে যেন মরবেন না। বন না হোক, বাড়ির কাছাকাছি একটা নিরালা মাঠ, তাও যদি না হয়, ফাঁকা ছাদে জোছনা দেখতে যাবেন, একা। শরতের রাত না হলেও চলবে। কিন্তু কাছাকাছি মোটর গাড়ির হেডলাইট কিংবা নগরের রাস্তার নিওন বাতি যেন বিরক্ত না করে। ভয় করবে? করবে না, একটা পরামর্শ দিই। গা-ছমছম অবস্থা হলে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে খুঁজে বার করবেন জীবনের সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্তটির কথা। হতে পারে বেদনাবিলাস, তবু আপনি পাবেন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ছোঁয়া। তবে সাবধান, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সেই কবিতা যেন ভুলেও মনে আনবেন না! ভয়ে ভিরমি খেতে হতে পারে।

'কে যেন বারেবারে তার
'পুরনো নাম ধরে ডাকে
বেড়ায় পায়ে পায়ে আর
কাঁধের পরে হাত রাখে।
অথচ খা-খা চারিধার
ঠাণ্ডা চাঁদ চেয়ে থাকে
ও হাতখানা তবে কার?
কে তবে ডাক দিল তাকে?'

কেন বললাম ওই অভিজ্ঞতার কথা? দুটো কারণে। প্রথমটা হচ্ছে আমাদের নায়কের চোখ। ফারুক ঠিক সেই ঠাণ্ডা চাঁদের মত তাকিয়ে আছে তার ভগ্নিপতি করিম শাহনওয়াজ খানের দিকে। করিম সাহেবের অস্বস্তি হচ্ছে শ্যালকের ওই দৃষ্টির সামনে। তিনি যে-মুহূর্তে অর্ধোচ্চারিত শব্দে 'আইভরিওয়ালী' বলে উঠলেন, তখনই বুঝে গেছেন যে একটা ফাউল হয়ে গেছে। কেকা যত না বিস্ময় বোধ করছে তার চেয়ে বেশি বিপন্ন দেখাচ্ছে তাকে। কেকা না হয় এই নাটকে নবাগতা। যা-হোক কিছু একটা দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া করিম খানের জন্য কঠিন হবে না। কিন্তু ফারুকের দৃষ্টিটা ভয়ঙ্কর। দেখে তাঁর কেবলই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতাটা মনে পড়ছে।

আরও একটা কারণ আছে পাঠককে নির্জন নিঃশব্দ নিসর্গে একা গভীর রাতে চাঁদ দেখতে বলার। সেটা হচ্ছে···থাক, এখন আর ভাঙছি না। নাটক মোটামুটি একটা ক্লাইম্যাক্সে আছে। এমন অবস্থায় ওদের ছেড়ে দূর প্রসঙ্গে চলে যাওয়া ভাল দেখায় না। দ্বিতীয় কারণ সময় বলা যাবে, এখন চলুন, আমরা করিম শাহনওয়াজ খানের ড্রাইনিং রুমে ফিরে যাই।

করিম সাহেব কতকটা আনমনে দূরে সরিয়ে রাখা কফির কাপ টেনে

নেন। আইরিন তাড়াতাড়ি কফির পট থেকে কফি ঢেলে দেয় তাতে।

'কফিমেট দেব?'

'না, থাক।'

আইরিন দুধের পট তুলে নিল। কিন্তু কাপে দুধ ঢালার আগেই তাকে বাধা দিলেন করিম শাহনওয়াজ খান। 'শুধু চিনি।'

আইরিন এক চামচ চিনি কফির ভিতর ঢেলে নাড়তে শুরু করে। 'আমি কিন্তু আগেই লক্ষ করেছি। কেবল ভেবে পাচ্ছিলাম না, বলাটা উচিত হবে কি না।'

চোখ বুজে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন করিম সাহেব। 'আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না। তবে শ্যালক সাহেব যদি দয়া করে...'

ফারুক আবার সেই ঠাণ্ডা চোখে তাকায়। তার মানে, 'খবরদার! এখন কোন ঝামেলা নয়।'

পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল যে আবেদাও খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়। 'আপনারা যেন কী একটা সমস্যায় পড়েছেন! আমাদের কোন দোষ হয়নি তো? যদি তেমন কিছু করেই থাকি, না বুঝে করেছি।'

নীরবে মাথা নাড়েন করিম খান। এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। আইরিন তাড়াতাড়ি বলল, 'ওদের কথা ধরবেন না। শালা আর দুলাভাইটি যখন একত্র হয়, তখন মনে হয়...'

আইরিন কথা শেষ করতে পারেনি। ফারুক বলল, 'প্লীজ, আপা, তোমার যা-ই মনে হোক, এখন কাঁচা মাটিতে দাগ বসিয়ে দিয়ো না।'

'বেশ।'

করিম সাহেব বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, কি বলো, শ্যালক সাহেব। ওরা দু'জনেই তোমাদের যশোরের বাড়িতে যাচ্ছে। ছন্দা মাই ডিয়ার মেয়ে। ওর নিশ্চয় আপত্তি হবে না।'

ফারুক নির্বিকার স্বরে বলল, 'আপত্তি হবে কেন?'

আবেদা বলল, 'প্রথমে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আলাপ করতে হবে। ওঁদের সম্মতি দরকার আছে না?'

করিম শাহনওয়াজ খান চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। 'তা বেশ তো! কথা বলো বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্যারদের" সঙ্গে। আমি যতদূর জানি এখানে তুমি কাজের স্বাধীনতা পাবে।'

আইরিনও উঠে দাঁড়াল। সকালে গোসল সেরে একটি চমৎকার শাড়ি পরেছে। কেকা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে। সাধারণত ঘরে পরার শাড়ির ভাঁজ আর পারিপাট্য বিষয়ে অত যত্ন নেওয়া হয় না। কিন্তু এই মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

আইরিনের চোখ করিম সাহেবের দিকে। হাসি-হাসি মুখে নিঃশব্দ অনুমোদন। ফারুক বলল, 'আমি কাল ফিরে যেতে চাই, আপা।'

'তা কী করে হয়? কাল সন্ধেয় পার্টি আছে।'

'আমারও কাজ আছে।'

আবেদা বলল, 'কথায় বলে, এক অতিথি অন্য অতিথিকে ভাল চোখে দেখে না। আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমাদের দেখে পালাতে চাইছেন নাকি?'

করিম সাহেব নিজের বেডরুমের দিকে পা বাড়ান। কাঁধ ঘুরিয়ে বলেন, 'শ্যালক সাহেব, অনেকদিন ধরে ঝামেলা করছ, এবার ভাল হয়ে যাও। আমাদের একটু সযোগ দাও, আমরা ঝামেলা করি। তুমি একাই তো আর বোঝোনি, আমরাও বুঝতে পেরেছি, ইটস্ আওয়ার টার্ন।'

'দুলাভাই, ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু।'

'হোক না।'

আইরিন কেকার কাঁধে হাত রাখল। 'তোমরা, ভাই, ওদের হচপচ মার্কা কথা শুনে ঘাবড়ে যেয়ো না। গেস্ট রুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও। একটু

পরে ড্রাইভার তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবে।'

আবেদা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। 'চিন্তা করবেন না, ভাবী। এক খান সাহেবকে যখন ঘায়েল করতে পেরেছি, সব খান সাহেবকেই সামলাতে পারব। আর খান সাহেবের শ্যালক বাহাদুর তো নিজেই বারবার ঢোক গিলছে। আপনি তার বোন, আপনাকে আর কী বলব?'

আইরিন হাসল, কিন্তু আর দাঁড়াল না। বাচাল মানুষদের খুব ভয় পায় সে। বেডরুমে গিয়ে দেখল, করিম শাহনওয়াজ খান টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে ওর জন্যই অপেক্ষা করছেন। স্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়েই ক্ল্যাম্পের মত আঁকড়ে ধরলেন।

চাপা শব্দে স্বামীর পিঠে দুমদুম করে কিল বসায় আইরিন। 'আরে, করছ কি, বাড়িভরা লোকজন।'

'সেলিব্রেট করছি। এ জীবনে যারে আমি...'

'ইস্! এ জীবনে যারে আমি! তুমি যা চেয়েছ, তার ঢের বেশি পেয়েছ, বুঝেছ সাহেব?'

আইরিনের কানের লতিতে মৃদু দংশনের পর মুখ না সরিয়ে সাহেব বললেন, 'সব বেগমই তাই বলেন। বুঝব না কেন? তবে কথা হচ্ছে আমি যা চাই সবই কি নিজের জন্যে চাইব? শ্যালক সাহেবটির জন্যে চাইতে পারি না?'

আইরিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'আমি অনেক আগেই দেখেছি। ঠিক সেই মূর্তির মত চেহারা। এবার একটু চেষ্টা করে দেখো না। ফারুক রাজি না হয়ে যাবে কোথায়?'

'হুঁ। ভাবছি ছন্দা ভাবীর সঙ্গে কথা বলব। আসল কাজটুকু তো তাঁকেই সারতে হবে। এদিকে বাকি ঝামেলার জন্যে আমরা আছি।'

'মন্দ বুদ্ধি নয়। টেলিফোন করবে?'

'হ্যাঁ।'

ড. কামার ফরিদ এক অদ্ভুত লোক। এমন লোকের কথা শুধু উপন্যাসেই পাওয়া যায়, আবেদা কখনও চোখে দেখেনি। তাঁর অফিস কামরাটি আরও বিচিত্র। টেবিলে চর্যাপদ থেকে তারাপদ— কোন পদই সম্ভবত বাকি নেই। কাব্যগ্রন্থগুলোর ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে বাঙ্গালার ইতিহাস এমনকি নীল বিদ্রোহের অজানা কাহিনী। নতুন-পুরানো মিলিয়ে গোটাদশেক পত্রপত্রিকা আছে, তার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ নামে একটি পত্রিকা চোখে পড়ে। একপাশে আছে সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়াশলাই বাক্স। স্ফুলিঙ্গ থাকলেও অগ্নি দুর্ঘটনার তেমন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হলো না। তবু মনে মনে হেসে ফেলে কেকা।

'তুমি হাসছ কেন?'

কেকা জন্মদিন অনুষ্ঠানে মোমবাতি নেভানোর মত করে এক ফুঁয়ে মুখের হাসি শূন্যে মিলিয়ে দিল। ড. কামার ফরিদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একে একে তিনটে দাঁত তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। গোঁফগুলোর অবস্থা নদীর ধারের কাশবন কিংবা বস্তির মায়ে-খেদানো ছেলেপিলেদের মত। রীতিমত ভাঙচুর শুরু করেছে ঠোঁটের দরজায় দাঁড়িয়ে। ড. ফরিদ নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন এই উপদ্রব। মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, নিখুঁতভাবে কামানো। কুচকুচে কালো প্যান্টের ওপর ঝলমলে ফুল-ছাপা শার্ট পরেছেন। পাশে উইণ্ডোসিলে আইসক্রিমের র‍্যাপিং পেপার আর কাঠি পড়ে আছে। তাঁর জামায় বুকের কাছে দুধের ম্লান দাগ। তার মানে একটু আগে আইসক্রিম খেয়েছেন। সেদিকে তাকিয়ে কেকা আবার হেসে ফেলে। হাসির কারণ অবশ্য আইসক্রিম নয়। একটা মাছি তাঁকে খুব বিরক্ত করছে। অসহায়ের মত হাত নেড়ে তাড়াতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু মাছি নাছোড়বান্দা। সে দুধ খাবেই।

'আরে, কী হলো? পাগল নাকি তুমি?'

'জ্বি না, স্যার। ওর নাম কেকা শাহীন। আমার সঙ্গে এসেছে।'

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আবেদার দিকে তাকালেন ড. ফরিদ। 'নাম কেকা শাহীন আর তোমার সঙ্গে এসেছে— শুধু এই দুটো জিনিসেই কি প্রমাণ করে যে সে পাগল নয়?'

আবেদা ঘাবড়ে গেল। 'জ্বি স্যার।'

'তোমরা আইসক্রিম খাবে?'

কেকা হাসি চাপতে গিয়ে মুখ নিচু করে রইল। আবেদা বলল, 'জ্বি স্যার, খেতে পারি। কিন্তু আমার কাজটার ব্যাপারে তো কিছু বললেন না!'

চোখ ছোট ছোট করে আবেদার দিকে তাকান ড. ফরিদ। 'তোমরা···মানে মেয়েরা এত লেখাপড়া, বিদ্যেচর্চা করতে চাও কেন? স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই?'

'আছে, স্যার।'

ধমকের সুরে ড. ফরিদ বললেন, 'বিশ্বাস করি না। স্বামী সোহাগিনী মহিলারা কখনই এত ঝুট-ঝামেলায় যেতে চায় না।'

আবেদা সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'তবে···আমি কেন যেতে চাই?'

'তুমি কেন যেতে চাও, তুমিই জানো। তবে তোমার মত অনেক মহিলাকে চিনি যারা শুধু লাগামছাড়া স্বাধীনতা আর একদল বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে হাওয়া খাওয়ার জন্যে এই লাইনে আসে।'

আবেদার রাগ হলো। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার সাহস হলো না। ড. কামার ফরিদ তার দরখাস্ত আর সার্টিফিকেট নাড়াচাড়া করছেন।

শান্ত স্বরে আবেদা বলল, 'আমি, স্যার, গবেষণা করতে চাই। সত্যি বলছি। আমার অন্য কোন ধান্দা নেই।'

'ঠিক বলছ?'

'জ্বি, স্যার।'

'দেন গো অ্যাহেড। কাগজপত্র বিকেলবেলা এসে নিয়ে যেয়ো। এই ফরমটা পূরণ করে যাও।'

'যশোরে একটা পুরানো ঐতিহাসিক বাড়ি আছে, স্যার।'

'সেখানে থাকার অসুবিধে হবে না?'

'জ্বি না।'

ড. ফরিদ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তোমার বোনটা সঙ্গে যাবে?'

নীরবে মাথা নাড়ল আবেদা।

'বেশ, ওখান থেকেই শুরু করো। সামনের মাসের প্রথম সপ্তায় এক নম্বর রিপোর্ট পেশ করবে।'

বিকেলে বাসায় ফিরে গেস্ট রুমের বারান্দায় ফারুকের মুখোমুখি হয় আবেদা আর কেকা। ফারুক তাকিয়ে আছে কেকার দিকে। চোখে নীরব প্রশ্ন: 'এত দেরি হলো যে!'

'কেকা, তুমি এখন ভিতরে যাও, আমরা যশোরে যাবার প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি।'

ফারুক আবেদাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না না, ও থাক না! অসুবিধে কী?'

আবেদা ম্লান মুখে বলল, 'বসো, কেকা।'

পাঁচ

জন স্টেইনবেক বলেছিলেন, সব শহরেরই নাকি একটা চরিত্র থাকে। যশোরেরও আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওই চরিত্র খুঁজে বার করা

কঠিন। কেউ কেউ বলেন, যশোর একটা খামখেয়ালী শহর। এখান থেকে বিশ মাইল দূরে নড়াইল। সেখানে থাকতেন এক বিখ্যাত শিল্পী। এস. এম. সুলতান। জীবিত অবস্থায় তাঁর খ্যাতি তেমন প্রকাশ পায়নি। তবে এখন যে তিনি অমর, সে-ব্যাপারে মরজগতের কারুর সন্দেহ নেই। লোকটি খ্যাপা ছিলেন, সাগরদাঁড়ির মাইকেল মধুসূদনের চেয়েও বেশি। চুলের মাঝখানে যেমন সিঁথি, তেমনি এই শহরের মাঝখানে এক আধপাগলা নদী আছে। কখনও দিব্যি ঘুমিয়ে থাকে মড়ার মত, পিঠের ওপর লাঙলের ফোঁড় দিয়ে ধান বোনো আর রবিশস্য ফলাও, সে মাইণ্ড করে না। আবার কখনও মূর্তিমতী চণ্ডালিনীর মত সরোষে ফুঁসে ওঠে সেই ভৈরব নদী, চোখের পলকে তচনচ করে দেয় বিশ-পঁচিশটা নিরীহ গ্রাম।

এইরকম এক দামাল শহর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে একসময় নির্জীব হয়ে ওঠে নিবিড় শ্যামলিমা পেয়ে। দক্ষিণে যাবার নেশা তাকে পেয়ে বসে। আপনি যদি ওই পথ ধরে হাঁটতে থাকেন, দেখবেন, পাকা দালান কোঠা ফুরিয়ে আসবে। মুরলির মোড় পেরিয়ে আরও চলে যান, বাম হাতে একটা ফাউণ্ডি ওঅর্কশপ পাবেন, আর তার গা ঘেঁসে পাবেন এক সরু রাস্তা। অনেক পুরানো, খোয়ার তৈরি। মনে হবে একটি কিশোরীর চুলের অবহেলিত লাল ফিতে— এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে অজানা অরণ্যের ভিতর।

ফিতে ধরে এগোনো যাক। ডানদিকে একটা পুকুর দেখতে পাবেন। রাস্তার কোন কোন অংশে আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে সেই পুকুর। দু'চারজন মহিলাকে দেখবেন, পাড়ে গাছের কাটা গুঁড়ি ফেলে তার ওপর কাপড় কাচছে। হয়তো তার বিপরীত পাড়ে ছিপ ফেলে বসে আছে কয়েকজন অলস মানুষ।

পুকুর শেষ হলে পাওয়া যাবে একটি শৌখিন জঙ্গল। প্রকৃতির নিজস্ব

বনানী নয়, সেখানে মানুষের হাত আছে। এরপর থেকেই একটির পর একটি প্রমাণ আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে— মানুষের দক্ষ, কুশলী হাত শুধু একটা বাড়ি নয়, পুরো গ্রামের শোভায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। শুধু গ্রাম কেন, একটা দেশের চেহারায় সুচর্চিত রূপ এনে দিতে পারে মানুষের হাত।

খোয়া বিছানো পথ শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সিংহ দরজা। সিংহের মূর্তি এখন নেই, সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আর্চওয়ে রয়ে গেছে। এগিয়ে চলুন আর্চওয়ে পেরিয়ে। দশ ফুট চওড়া ঋজু পথ, দু'দিকে আপনাকে সংবর্ধনা জানাবে দেশি-বিদেশি ক্রোটনের অবাক-করা সমাহার। নিয়মিত ব্যবধানে একটি করে ইউক্যালিপটাস।

পথটা সামনে গিয়ে দু'দিকে ডানা মেলে দিয়েছে। বামের পথ শেষ হয়েছে একটি ঐতিহাসি কুঠিবাড়ির গাড়িবারান্দায়। ডানদিকের পথ আরও দুটো ছোট দরজার আপত্তি ডিঙিয়ে পৌঁছে গেছে বাড়ির একেবারে ভিতর দিকে। এখানে একটা পুকুর আছে।

এই পুকুরটির বর্ণনা আমি দিচ্ছি। তবু অনুরোধ করব, ফারুকের অনুমতি নিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসবেন। কেননা একটা পুকুর যে এত সুন্দর হতে পারে আর তা ঠিকমত ভাষায় বোঝানো যেতে পারে— আমি ভাবতেই পারি না। একপাশে জরাজীর্ণ ঘাট, তবু বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটির মত অপার মমতায় জড়িয়ে রেখেছে পুকুরের সংসার— চারদিকের উদ্ধত নারিকেল আর তালগাছ, খেজুর বাগানের নিষ্ঠুরতা, দু'চারটে স্বার্থপর কুল আর ডুমুর গাছ, খামখেয়ালী পদ্ম আর শালুক, কলমিলতার উৎপাত—এইসব নিয়ে। পুকুরের কোন পাড়ে মাটি-কাদার চিহ্ন নেই। পুষ্ট নলখাগড়া আর দীর্ঘদেহী ঘাসের ঝোপ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পুকুরের অকম্প বুকে— নিটোল জলের আদর

কুড়োবার জন্য।

কুঠিবাড়িতে এসে পৌছনোর আধঘণ্টার মধ্যে কেকা ভুলে গেল, সে এখানে আসতে চায়নি। তার তীব্র আপত্তির মুখে আবেদা যশোরের প্রোগ্র্যাম চূড়ান্ত করেছে। তবে বলা বাহুল্য যে শেষ মুহূর্তে ফারুক জবরদস্তি না করলে হয়তো আসা হত না। কেকা ঠিক করেছিল, সে পাবনায় ফিরে যাবে। আবেদার কাজটা বেশ দীর্ঘ সময়ের। তা ছাড়া কাজটার ভিতরে যেমন আছে একঘেয়েমি, তেমনই জটিলতা। আবেদা খুব বেশি আপত্তি করেনি, কিন্তু ফারুক এমন আভাস দিল যে কেকা সঙ্গে না গেলে একা আবেদা কোন সাহায্য পাবে না তার কাছ থেকে।

কিন্তু ভিতরদিকের বাগানে ঘুরে বেড়ানোর সময় কেকার মনে হলো, না আসাটা ভুল হত। পৃথিবীটা রহস্যময়। কোথায়, কোন গলির অন্ধকারে, কোন পোড়োবাড়ির অন্দরে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে আছে মন-কেড়ে-নেওয়া সব দৃশ্য, কেউ জানে না।

বিকেল তিনটের দিকে ওরা এসে পৌছেছে। ছন্দা ভাবী মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিয়েছেন ওদের। লাইব্রেরির আসবাব, বইয়ের আলমারি, এমনকি কাগজ-কলম-দোয়াত ঝেড়ে-মুছে ব্যবহারোপযোগী করে রেখেছিলেন টেলিফোনে খবর পেয়েই।

লাইব্রেরিটিও দেখার মত। মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করে আলমারির ভিতর থরে থরে সাজিয়ে রাখা বইগুলোর কোনটি একশো বছর আগের, কোনটি আরও পুরানো। ফ্লাস্কভর্তি চা আর জগভর্তি পানির আয়োজনসহ আবেদার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেছেন ছন্দা ভাবী।

'আপনি এবার কাজ শুরু করতে পারেন।'

আবেদা হৃষ্টচিত্তে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে কেকার দিকে তাকান। কেকা বাড়িটা ঘুরে দেখতে চায়। তার মনে হয়, অনেককিছু দেখার আছে এই বাড়িতে।

ছন্দা ভাবী বললেন, 'বোনটার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। ও আমার সঙ্গে থাকবে। ওর সঙ্গে সই পাতাব আমি। এসো, ভাই।'

কেকা ছন্দা ভাবীকে অনুসরণ করে বেরিয়ে আসে। ছন্দা তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। ছেলেমেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। কেকা তাঁর পরিপাটি সংসার দেখে অবাক হলো। দেয়ালে উজ্জ্বল উচ্ছল এক তরুণের ছবি। বুঝতে কেকার অসুবিধে হয় না, উনিই মরহুম কাজী সালাম। ছবির ফ্রেম বিবর্ণ হয়ে উঠেছে বয়সের ভারে, একটা মালা শুকিয়ে কাঠ-কাঠ হয়ে আছে। হয়তো মরহুমের মৃত্যু দিবসে মাল্যদান করা হয়েছিল ছবিতে।

বিপরীত দিকে অনুরূপ আকারের একটা ফ্রেমে ফ্রিজ হয়ে আছে কাজী ফারুকের হাসি। কেকা একনাগাড়ে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে ছন্দা ভাবী তাড়াতাড়ি বললেন, 'কী গো, সই? মাতোয়ারা হয়ে গেলে যে! এর চেয়ে অনেক ভাল ছবি আছে ওর। তা ছাড়া যে-মানুষ সশরীরে উপস্থিত আছে তার ছবি দেখার চেয়ে বরং এক কাজ করো, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

এর চেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিতের দরকার হয় না, কেকা সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু এখনই সময়। বাধা দেওয়া দরকার। একদল মানুষ কি চাইল না চাইল, আর অমনি নাচতে নাচতে কেকা ঘাড় হেলিয়ে সায় দেবে নাকি?

কেকা উঠে দাঁড়াল। 'বাড়িটা খুব সুন্দর। ঘুরে দেখতে চাই।'

ছন্দা একটা চিরুনি নিয়ে এগিয়ে এলেন। 'তা বেশ তো। তার আগে এসো, তোমার চুলটা ঠিক করে দিই।'

লজ্জা করে কেকার। কিন্তু ছন্দা ভাবীর হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবার আশা নেই। কেকা বাধ্য মেয়েটির মত বিছানায় ঘুরে বসল। পিছনে বসে ছন্দা তার চুলে চিরুনি বোলাতে লাগল।

চুল পরিপাটি করার কাজ শেষ হবার আগেই বাধা পেলেন ছন্দা। নাজমা দরজার কাছে উঁকি দিয়ে বলল, 'আম্মাজান, বড় সাহেব ডাকছেন।'

'একটু বসো, ভাই,' বলেই উঠে পড়লেন ছন্দা। বাড়ির এক কোণায় প্রায় বিচ্ছিন্ন অংশের একটি কামরায় থাকে ফারুক। কিন্তু অতদূর যেতে হলো না, মাঝপথেই ফারুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

চুল বাঁধার কাজটা নিজেই শেষ করল কেকা। চিরুনিটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে পড়ল কেকা।

কাছেই দুটো দৃশ্য। যেন দুটো প্রেক্ষাগৃহের দুই পরদায় আলাদা ছবি দেখানো হচ্ছে। একটিতে নিবিড় সান্নিধ্যে কথা বলছে একজোড়া নারী-পুরুষ। এই গহন বনের মত বাড়িতে এরা থাকে। কারুর কোন পিছুটান নেই, বাধা নেই। আছে অঢেল অবসর। থাকতেই পারে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক। হোক বন্ধুত্বের, প্রেমের, কিংবা···

ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কেকা অন্য পরদার ছবির দিকে তাকায়। দু'পাশে সযত্ন পরিচর্যায় গড়ে তোলা বাগানের মাঝখান দিয়ে সিমেন্ট-বাঁধানো সরু পথ রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেছে পুকুরের দিকে, দুটো বেপরোয়া মোড় নিয়ে শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছে পুরানো চাতালের কোলে। কেকা কেন যেন একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর পুকুরের পথ ধরল।

পুকুরে এসে অবশ্য মন ভাল হয়ে যায় কেকার। শিল কড়ই গাছের ওপর বসে বর্ণালি লেজ দোলাচ্ছে একটা নাম-না-জানা পাখি। আর সবুজ সোহাগের মাঝখানে পুকুরের স্থির জল যেন আদরিনী বালিকার মত। যদিও শীত আসি-আসি করছে, বাতাসে না-ঠাণ্ডা না-গরম একটা ভাব, তবু কেকার লোভ হয় ওই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ঘাটের শেষ সিঁড়িতে— যেখানে নিষ্ঠুর পাষাণ আর শুশ্রূষাময়ী

জলের দেখা হয়েছে— গিয়ে বসল কেকা। হঠাৎ টের পেল, তার পিঠে মৃদু নিঃশ্বাসের ছোঁয়া দিচ্ছে কেউ। ফিরে তাকানোর আগেই ছন্দা ভাবীর গলা শুনতে পেল।

'কি গো, সই, চলে এলে যে!'

'আপনি বেরিয়ে গেলেন। তাই ভাবলাম—'

'ভাবলে এই সুযোগে পালাবে। কতদূর পালাবে, শুনি?'

ছন্দার গলায় অকপট বন্ধুত্বের সুর আছে। কিন্তু বাড়ির মালিক সেটা ঠিক পছন্দ করবেন তো? ফারুক সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে কেকার। লোকটি কর্তৃত্বপরায়ণ। সাধারণত বিত্তবান মানুষেরা কর্তৃত্ব পছন্দ করে। বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে প্রেমের ছদ্মাবরণে তারা আসলে প্রভুত্ব বিস্তারেরই পাঁয়তারা করে। কেকা নিজের জীবনে এই অধ্যায় থেকে দূরে থাকবে। অনেক আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, কোন ধনীর জীবনে জীবনপ্রবাহ মেশাবে না।

কেকা হাসল। 'আমি পালিয়ে বাঁচার নীতিতে বিশ্বাস করি না, ভাবী।'

ছন্দা কাজী কেকার বেণী ধরে মৃদু টান দিলেন। 'ও মা! মেয়ের তেজ দেখি তুষের আগুনের চেয়ে বেশি। সেরেছে রে!'

'সেরেছে মানে!'

ছন্দা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। 'গান গাইতে পারো?'

'ছেলেবেলায় কখনও কখনও গেয়েছি। এখন...জানি না, গাইতে পারব কিনা। আপনি নিশ্চয় খুব গানভক্ত!'

'আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমার কথা বাদ দাও, রূপসী। নিজের কথা বলো। রান্নার হাত কেমন?'

কেকা ঘুরে বসল। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, মনে হচ্ছে।'

খিলখিল করে হেসে পুকুরে ঢেউ তুললেন ছন্দা। ঢেউগুলো নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে কলমিলতার দলের দিকে। তাঁর শরীরেও এক অপরূপ ঢেউ ওঠে। কেকা মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। এই বয়সেও কেমন সুন্দর গাঁথুনি মহিলার শরীরের। আবেদা আপাকে হারিয়ে দিতে পারেন।

'হাসছেন কেন? হাসির কিছু বলেছি বুঝি!'

'থাক ও-কথা। চলো, চা খাওয়ার সময় হলো। চা খেতে খেতে একটা গান শোনাবে আমাদের।'

'কি যে বলেন, ভাবী!'

ছন্দা উঠে দাঁড়িয়ে কেকার হাত ধরে টান দিলেন। 'ওঠো বলছি।'

বৈকালিক চায়ের আসরে গান না শুনিয়ে কেকার উপায় থাকল না। বিস্ময়ের সঙ্গে সে লক্ষ করে, কয়েকটা জিনিস একবার শিখলে মানুষের সাধ্য কি ভোলে! যেমন সাঁতার কাটা, সাইকেল কিংবা গাড়ি চালানো। গানও যে অমনই একটা বিষয়, তার জানা ছিল না। পনেরো বছর কিংবা তারও বেশি সময় বাদে একটা গান শুরু করতে হলো তাকে। ঠিক সে নিজে শুরু করেনি, ফারুকের পীড়াপীড়িতেই রাজি হয়েছিল। পীড়াপীড়ি শব্দটা ফারুকের বেলায় ঠিক খাটে না। সে কাউকে কোন ব্যাপারে একবারের বেশি অনুরোধ করতে শেখেনি।

চায়ের আসরে সে বেশ অথোরিটি নিয়েই বলেছে, 'আমরা এবার সত্যিকার কেকাধ্বনি শুনতে পাব।'

প্রত্নতত্ত্বের গবেষক ভাষা-সাহিত্যের খবর বিশেষ রাখে না। 'কেকাধ্বনি মানে!'

ছন্দা তার কানে কানে বললেন, 'কেকা মানে ময়ূরের ডাক, জানেন না?'

ঠোঁট উলটে মুখ ঘোরাল আবেদা। ফারুক আবার বলল, 'যে গান

জানে সে অন্যকে না শুনিয়ে পারে না। তবে মাঝে মাঝে উপর্যুপরি অনুরোধ পছন্দ করে। কেকা শাহীন যদি তাই চায়...'

কিন্তু কী গান গাইবে কেকা? কেউ গাইতে অনুরোধ করলে ওর সব প্রিয় গান ভুল হয়ে যায়। ফারুক নিজেই বলল, 'ওই গানটা জানেন? "আজি যেমন করে গাইছে আকাশ..."?'

পনেরো বছর পর গাইতে শুরু করেও কেকা দেখল, ওই গানের একটি শব্দও ভোলেনি। গানটা তার বড় প্রিয়।

ছয়

সকালবেলায় আবেদা বলে রেখেছিল, সে সারাদিন ব্যস্ত থাকবে, তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। নাশতা খাওয়ার সময় তাকে ডাকেনি নাজমা। ট্রেতে খাবার সাজিয়ে লাইব্রেরিতে রেখে এসেছে। ফ্লাস্কভর্তি গরম দুধ আর বাড়তি এক জগ পানিও পৌঁছে দিয়েছে।

আবেদার ব্যস্ততার তেমন কিছু কারণ ছিল না। নলডাঙ্গার জমিদার বাড়িতে একবার যাওয়ার কথা। ঐতিহাসিক পদ্মপুকুরে যখন খনন কাজ চলছিল তখন কিছু প্রাচীন কালোপাথর পাওয়া যায়। আশেপাশের বাড়ির দেয়ালে আর ভিতের সঙ্গে তার কিছু প্রমাণও থেকে গেছে। অনেকে সেইসব মহামূল্য পাথর কাজে লাগিয়ে ইটের খরচ বাঁচিয়েছে। এলাকাটা ঘুরে দেখলে নলডাঙ্গার জমিদারবাড়ি অধ্যায় সম্পর্কে বেশ দু'কথা

লিখতে পারবে আবেদা।

তা ছাড়া বিষ্ণুমন্দিরের ফ্রেম সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ রাইট আপ চাই আজকের মধ্যেই। বেশ কিছুদূর এগিয়েছে কাজটা। লাইব্রেরিতে আধা ডজন বই পাওয়া গেছে শুধু পুরানো মন্দির আর ধ্বংসাবশেষের ওপর।

কেকা ঠিক করেছিল আজ সারাদিন সে আবেদা আপার কাছে যাবে না। তাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে নেই তার। এই সময় তাকে বিরক্ত করার মানেই হচ্ছে কাজের দেরি হয়ে যাওয়া। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে না পারলে ঝামেলা হতে পারে। বাড়িতে কি পথেঘাটে হাজার মানুষ মেয়েদের চোখের দিকে তাকায়। কিন্তু মেয়েরা ঠিক জানে কোন চোখে কোন ছবি ভাসছে। কাল ঘরোয়া গানের অনুষ্ঠানের পর থেকেই কেকার মনে হচ্ছে, এখানে আর বেশিদিন থাকা ঠিক হবে না। ফারুকের চোখে ঘোর ঘনাচ্ছে ক্রমেই।

সে একটা বই নিয়ে বিছানার প্রান্তে বসেছিল চোখ বোলাবে বলে। হয়ে উঠল না। দরজার পরদা ফাঁক হলো। আকাশ জুড়ে মেঘ জমার পর যদি হঠাৎ দমকা বাতাসে পরিষ্কার হয়ে যায় সব, বৃষ্টির বদলে জিভ ভেঙচায় ঝলমলে রোদ, কেমন লাগে? কেকার অবস্থা ওইরকমই হলো। অবচেতন মনে সে ফারুককে আশা করেছিল। নইলে আবেদাকে দেখে অমন নিরাশ হবে কেন?

আবেদা এসে কেকার পাশে বসে। তার চশমা ঝুলে পড়েছে নাকের ওপর। মুখে আধা বিব্রত, আধা কৌতুকের হাসি। 'কী করছ, কেকা?'

কেকার হাসি পাচ্ছে। তার হাতে বই, আধশোয়া হয়ে বসে আছে বিছানায়। তার পরও যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'কী করছ', তাকে কী বলা যায়? 'পেঁয়াজ বুনছি?'

হাসি পাবার কারণ অবশ্য ঠিক সেটা নয়। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় বাবার কথা। হয়তো কাউকে সময় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। কবজি

উলটে ঘড়ি দেখতে দেখতে হয়তো জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বললেন, 'এখন? এখন বাজে...'

কেকার বাবা এমন উদ্ভট প্রশ্নে বিষম বিরক্ত হন। প্রশ্নের উত্তর পাবার আগ্রহ হারিয়ে তিনি বলেন, 'জ্বি না, এখন ক'টা বাজে তা দিয়ে আমার কি দরকার, দশ ঘণ্টা আগে ক'টা বেজেছিল, যদি বলতে পারেন...'

আবেদা কেকার হাঁটুর ওপর হাত রেখে বলল, 'হাসছ যে!'

এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, কেকা হাসির কারণ ব্যাখ্যা করল। ভেবেছিল আবেদা লজ্জা পাবে। কোথায় লজ্জা, কোথায় কি! কোন কোন মানুষ লজ্জা পেতে জানে না, কিংবা পেলেও চমৎকারভাবে তা গোপন করে যেতে পারে।

আবেদা বলল, 'খালুর কথা আর বোলো না। যা হাসাতে পারেন! তবে আমার এক দেওর আছে, সে যে কি উইটি, ভাবতে পারবে না। তুমি অবশ্য তাকে দেখোনি। হেলাল। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দোষের মধ্যে, তার গায়ের রং কালো, আর কথা বলার সময় তোতলায়। তোমার সঙ্গে যা মানাত তাকে! একবার তোমার কথা বলতেই দেখি লাফিয়ে উঠল। তার নাকি ঠিক তোমার মতই একজন...'

কাট ইন করার সময় হয়ে গেছে। কেকা বলল, 'আবেদা আপা, তুমি ঠিক এগুলো বলার জন্যে কথা শুরু করোনি, অন্য কি যেন বলতে চেয়েছিলে।'

'ও হ্যাঁ, যা বলছিলাম। হেলালকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "ক বাজে?" সে কি বলল জানো? ওয়ান পয়জন।'

কেকার প্রেজেন্স অভ মাইণ্ড খারাপ নয়। তবু দু'সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হলো। তারপর হেসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। 'বিষ' আর 'বিশ'— শুনতে একরকম হলে কি হবে, পার্থক্য অনেকখানি। চট করে মিলিয়ে মাথায় আনা যায় না। 'একটা বিশ!'

হাসি থামলে সে বলল, 'আমাদের মজহার ভাইকে একবার একদল ছেলে ধরল। চাঁদা শিকারী। মজহার ভাইয়ের সাফ উত্তর, "হবে না।" ছেলেরা বলে, "কি উলটাপালটা বলছেন সাহেব? জানেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছি!" মজহার ভাইও চোখ লাল করে বলেন, "বিশশো বিদ্যালয়ের ডবকনা দেখিয়ো না। আমি বাইশশো বিদ্যালয় পার হয়ে এসেছি।"'

আবেদা অবশ্য আর বেশি হাসাহাসির মধ্যে গেল না। কেকার সঙ্গে কথা আছে তার। কেকার মাথায় মৃদু নাড়া দিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে এখানে থাকতে?'

কেকা কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকে আবেদার দিকে। প্রশ্নটা অবাক করার মত। নাকি এটাও আসল কোন কথার আগে গৌরচন্দ্রিকা!

'অমন করে তাকাচ্ছ কেন, ভাই?'

কেকা বলল, 'আসলে তোমার হয়েছে কী, বলো তো! আগেই নোটিশ দিয়েছিলে আজ সারাদিন তুমি ব্যস্ত থাকবে। এখন দেখি দিব্যি আড্ডা দিতে বসেছ। কাজ ভাল লাগছে না?'

হাই তুলল আবেদা। কেকার চোখে মুগ্ধতা নামে আবছা কুয়াশার মত। হাই তোলার সময় ডমরুমধ্য মহিলাটির শরীর অপরূপ হয়ে ওঠে। 'সত্যি, কেকা, কাজ করতে ভাল লাগছে না। ডকটরেট করার লোভ ষোলো আনা। কিন্তু রিসার্চের কথা ভাবলে গা গুলায়।'

কেকা হাসল। 'তোমার অবস্থা দেখছি পিটার সাহেবের মত।'

'পিটার সাহেব আবার কী বলেছেন?'

'বলেছেন, "লেখক হতে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু লেখালিখি একদম সহ্য হয় না।" তা কি আর করবে, একটু বিশ্রাম নাও। ফারুক সাহেবকে বলে দেখতে পারো, উনি গাড়িতে চড়িয়ে কোথাও...'

বাধা দিল আবেদা। 'ফারুক সাহেবের মতিগতি কিন্তু সুবিধের নয়,

কেকা।'

কেকা যেন অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে একটা স্টেপ মিস করল। আবেদা ঠিক কী বোঝাতে চায়? তাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব গোপন কোন রহস্যের কথা সন্তর্পণে ফাঁস করছে কেকার কাছে। এমনকি ভবিষ্যতে কেকার সাহায্যের দরকার হবে তার, এমন আভাসও চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

দরজার কাছে চটির শব্দ। নাজমা পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। 'আপনাদের চা লাগবে?'

'আহা! মেঘ না চাইতেই জল!' আবেদা একটা বালিশ টেনে নিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। 'চায়ের সঙ্গে একটু আদাও দিয়ো। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কেকা, মাথাটা টিপে দাও না!'

অন্য সময় হলে কেকা অনুরোধ এড়িয়ে যেত। কিন্তু এখন আবেদার কথা শোনা দরকার। তার আসল কথাগুলোই বাকি রয়ে গেছে।

'বলো, আবেদা আপা, কি বলবে।'

আবেদা চোখ বুজে থেকে বলল, 'কোন কথা?'

'ফারুক সাহেবের মতিগতি বিষয়ে কি যেন বলতে চেয়েছ।'

আবেদা আবার আড়মোড়া ভাঙল। 'সবই আমার এই পোড়া শরীরের দোষ, বুঝেছ কেকা? যেখানেই যাই একটা না একটা সমস্যা বাধে।'

কেকা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ফারুক সাহেব আবার তোমার শরীর নিয়ে কী করলেন?'

'আবার টীজ করছ, তাই না?'

কেকা হাসল। 'না, না। টীজ করব কেন?'

'এই, শোনো, ফারুক সাহেব বেশ কয়েকবার আমার রূপের প্রশংসা করেছেন। আচ্ছা, ভদ্রলোকের বয়স নিশ্চয় ত্রিশের ওপর। বিয়ে

করেন না কেন, বলো তো!'

কেকা হাসি গোপন করে বলল, 'কি করে বলব? আমি তো ওনার জীবন-যৌবনের সমস্যার কথা কিছু জানি না। জিজ্ঞেস করে দেখব নাকি?'

অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করল আবেদা। 'ফাজলামি কোরো না।'

'বেশ, করব না।'

'আমাকে ওনার বেশ মনে ধরেছে, কি বলো?'

'ধরতে পারে।'

বুকের সঙ্গে বালিশ আঁকড়ে ধরে কয়েকবার মোচড়ামুচড়ি করল আবেদা। 'হাসানের চেয়ে ওর বয়স বেশি, কিন্তু দেখতে ওর চেয়ে অনেক কম মনে হয়। আর দেখতে ঠিক রাজপুত্রের মত। হাসান যেভাবে মুটিয়ে যাচ্ছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই, ক'দিন বাদেই ঘরের দরজাগুলো কেটে বড় করতে হবে।'

ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল আবেদা। সে-শব্দ চাপা পড়ল কেকার কৃত্রিম আহাজারিতে। 'বিবাহিত মানুষের এই এক বিশ্রী সমস্যা, আবেদা আপা। স্ত্রী ভাবে, তার স্বামীটি পৃথিবীর সবচেয়ে অপদার্থ আর স্বামী ভাবে, অন্য যে-কোন নারী তার স্ত্রী হলে ভাল হত।'

আবেদা মাঝে মাঝে গভীর বিস্ময়ে তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এই কাজিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর জ্ঞানের তল পাওয়া ভার। আর কঠিন কঠিন সব কথা কেমন অনায়াসে, আটপৌরে ভাষায় বলে ফেলে! ওকে ঈর্ষা হয় আবেদার, কিন্তু ওকে ছাড়া তার চলেও না।

'আমার ক্ষেত্রে···কথাটা কিন্তু···সত্যি নয়,' থেমে থেমে দ্বিধার সঙ্গে বলল আবেদা। 'তোমরা হাসানকে যত সুন্দর দেখো, সে মোটেও তত সুন্দর নয়। তা ছাড়া বাইরের মানুষের কাছে সে খুব নম্র, ভদ্র। সারা জীবন আমার হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে, সেটা আর ক'জন জানে?'

'তাই বুঝি তুমি এখন ঘর-বর পালটাতে চাও!'

কেকার কান মলে দিল আবেদা। 'তুমি তো শুধু আমারই দোষ দেখছ! আমার পিছন পিছন যারা ঘুরঘুর করে, ভাল ঘর আর ভাল বরে লোভ দেখায়, পটাতে চেষ্টা করে, তাদের দোষ নেই?'

কেকা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। নাজমা চা দিয়ে গেছে অন্যমনস্কভাবে একবার গরম-কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল কেকা তারপর বলল, 'যদি কেউ অন্যের বিয়ে-করা বউয়ের পিছনে ওভাবে লেগে থাকে তাদের নিশ্চয় দোষ আছে। কিন্তু ফারুক সাহেব বোধহয় সেরকম মানুষ নন, আবেদা আপা। তোমার কোন ভুল হচ্ছে। হয়তো ওনার ব্যাপারে তুমি একটা অবসেশনে ভুগছ।'

আবেদা উঠে বসল। 'মোটেই না। উনি স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যে আমার ওপর তার দুর্বলতা জন্মেছে। ঘটনাটা ভালভাবে ভেবে দেখো। আমি গেছি তাঁর বোনের বাসায়। আমার সমস্যা তিনি কীভাবে নিজের কাঁধে চাপিয়ে সোজা এখানে নিয়ে এলেন, লক্ষ করেছ?'

মানুষের ইগো ভেঙে তাকে যুক্তির পথে নিয়ে আসা সহজ নয়, কেকা ভালভাবেই জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে আবেদা আপার ধারণা ভেঙে দেওয়া সহজ হবে না কেকার জন্য। ভাঙতে গেলে নিজের ভূমিকা এসে পড়বে। বলতে হবে, 'ফারুক সাহেব আমাদের এখানে নিয়ে আসতে আগ্রহী হয়েছেন— সে তোমার জন্যে নয়, আবেদা আপা, আমার জন্যে। হয় তুমি তাকে ভুল বুঝছ, না হয় ঠিক বুঝেও শুধু শুধু ভণ্ডামি করছ।' কিন্তু কেকা এ-কথা আবেদাকে বলতে পারবে না, কিছুতেই না। আবেদাকে নিজের বুদ্ধিমত চলতে দেওয়া উচিত।

দুর্বল স্বরে কেকা বলল, 'তাতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল, ফারুক সাহেব তোমার প্রেমে পড়েছেন?'

আবেদ্যার স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে। 'তোমার প্রেমে পড়াই উচিত

ছিল তার। সেটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু…ভাগ্যের ওপর তো কারুর হাত নেই, ভাই।'

দরজার পরদা সরে গেল। নাজমাকে দেখেই আবেদার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। 'বারবার ঘরে ঢুকছ কেন? খালি কাপগুলো নেবে? চা তো শেষ হয়নি!'

'চা না, আপা। সাহেব আপনাদের ডাকতেছে।'

'আমাদের!' আবেদা তীরের গতিতে উঠে দাঁড়াল। স্খলিত শাড়ি বিন্যস্ত করতে করতে বলল, 'দু'জনকেই?'

'জ্বে। উনি তো তাই বললেন।'

গলার স্বর নামিয়ে আবেদা বলল, 'তুমি থাকো। আমি একাই যাই। হয়তো লজ্জা পেয়েছে আমাকে একা ডাকতে, তাই দু'জনের কথাই বলেছে।'

মুখ টিপে হাসল কেকা। 'আমারও তাই মনে হয়।'

কথাটা পুরোপুরি না শুনেই বেরিয়ে পড়ল আবেদা। তার মুখে লালিমার সঙ্কেত। মিনিট দুয়েকের মধ্যে যখন সে ফিরে এল, কেকা অবাক হয়ে গেল। লালিমা মুছে গিয়ে সে-মুখে জমে উঠেছে থোকা থোকা অন্ধকার।

'কী হলো, আবেদা আপা?'

ভাঙা গলায় আবেদা বলল, 'আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এবার তোমাকে ডাকছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে কেকা বলল, 'আমাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন নাকি ফারুক সাহেব?'

সাত

হালকা ছাই-রঙা ড্রিলের প্যান্টের সঙ্গে সাদা হাফহাতা গেঞ্জিতে চমৎকার দেখাচ্ছে ফারুককে। হরিণের চামড়া ঢাকা ডিভানে বসে আছে সে— পায়ের ওপর পা ক্রস করে। বিছানাটা আগাগোড়া বেডকাভার মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এক কোণে। কয়েকটা বই ছড়িয়ে আছে তার ওপর। একটা বই খুব দৃষ্টি কাড়ে। 'জুলাইজ পিপল।' আকর্ষক প্রচ্ছদ না লেখিকার নামের জন্য— বুঝতে পারছে না কেকা। ট্রলির ওপর আকাই মিউজিক সেন্টারে মৃদু শব্দে গান হচ্ছে। 'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।'

ওকে দেখে সোজা হয়ে বসল ফারুক। 'আসেন, কেকা শাহীন।'

কেকা দ্বিধা থরো-থরো পায়ে এগিয়ে গেল। কোথায় বসবে? কোণার খাট ছাড়া আর কোন জায়গা নেই বসার। পায়ের নিচে কার্পেটটা বেশ আরাম দিচ্ছে তার ত্বককে। বিছানায় বসাটা ঠিক হবে, নাকি কার্পেটেই বসে পড়বে— ভেবে পায় না কেকা।

ফারুক এই দ্বিধার হাত থেকে তাকে মুক্তি দিল। ডিভান থেকে উঠে সে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। 'আপনি এখানেই বসেন, কেকা শাহীন।'

কেকার অবশ্য ডিভানের ব্যাপারে আগ্রহ নেই। কার্পেটের ওপর বসাই বেশি সুবিধের। তাতে বিছানার বইগুলো নাড়াচাড়া করতে

সুবিধে হবে।

'না, না, উঠছেন কেন? আমি এখানেই বসব।'

কেকা বসে পড়েছে খাটে হেলান দিয়ে। ফারুকও কয়েক ফুট দূরে বসে পড়ল কার্পেটের ওপর। 'আপনার রুচি-পছন্দের সঙ্গে আমার বেশ কিছু মিল আছে। আমার প্রিয় আসন এই কার্পেট। আপনি সঙ্কোচ করবেন— এই ভেবে ওপরে বসে ছিলাম, মিস শাহীন।'

হাসল কেকা। 'শুধু কেকা বলে ডাকলে হয় না? শাহীন নামে সাধারণত কেউ আমাকে ডাকে না। আপনি ডাকছেন, অস্বস্তি লাগছে।'

ফারুককে চিন্তিত দেখায়। 'শাহীন নামের ওপর আমার বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই। তবে ওই নামের সঙ্গে কেমন একটা ''শাইনিং শাইনিং'' ভাবের সম্পর্ক আছে। বাংলা মাসের খবর রাখেন?'

'একটু একটু। কেন, বলেন তো?'

'এটা কী মাস?'

কেকা একটু ভেবে বলল, 'কার্তিক। পাঁচ তারিখ।'

ফারুকের মুখে নীরব হাসি ছড়িয়ে পড়ে। কেকা ওই মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরে ভিতরে একটু কাঁপল। বুকের গভীর গোপনে স্থির জলাশয়ে টুপ্ করে একটা কুল পড়ল যেন। নাচতে নাচতে তরঙ্গ ছুটে যাচ্ছে তীরের দিকে। কোন পুরুষের হাসি এই প্রথম নাড়া দিয়েছে তার তরুণী হৃদয়।

'উত্তর সঠিক হয়েছে। দশের মধ্যে দশ। পরিচ্ছন্নতার জন্যে আরও এক। মোট এগারো।'

বিষম পাজী লোক তো! দশের মধ্যে এগারো নম্বর দেয়। হাসি চাপা ভারি মুশকিল হলো। বুক থেকে আঁচল তুলে মুখ ঢাকল কেকা। তারপর ফারুকের দৃষ্টি লক্ষ করে চমকে গিয়ে আঁচল ফিরিয়ে দিল আগের জায়গায়। শুধু পাজী নয়, লোকটা ফাজিলও বটে।

'শুধু নম্বর দেবার জন্যে প্রশ্ন করিনি। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। শ্রাবণ মাসের বর্ষাধোয়া আকাশ দেখেছেন? বেশিদিন আগের কথা তো নয়, আড়াই কি তিনমাস আগের কোন একটা দিনের কথা মনে করেন।'

কেকা উদাস উদাস চোখ মেলে ফারুকের দিকে তাকায়। ফারুকের হৃৎপিণ্ড দু'একবার গোঙানি দিয়ে নিয়ম ভঙ্গ করে। সেই চোখ, সেই চাহনি। অনেক প্রতীক্ষার পর ফারুক তাকে কাছে পেয়েছে।

'কষ্ট করে মনে করব কেন? বৃষ্টি আমার প্রথম প্রেম। বর্ষামুক্ত হাসি তো...কী বলব...প্রেমিকের দেওয়া উপহারের মত। বৃষ্টি কখনও আমার চোখের আড়াল হয় না। বর্ষার পরের নিবিড় নীল আকাশ তো আমি দেখবই।'

ফারুক মেঘলা স্বরে বলল, 'ওই যে নীল আকাশের মিষ্টি মুখ, রোদের হাসি...''শাইনিং'' শব্দের সঙ্গে ওই দৃশ্যগুলোর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কথাটা বোঝাতে পারলাম কি না জানি না।'

'আপনার পরীক্ষায় পাস করেছি, বুঝলাম। একটু আগেই তো আবেদা আপা এখান থেকে ঘুরে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি আমাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন কি না। দেখছি আমার ঠাট্টাই সত্যি। ইন্টারভিউ ছাড়া আর কি? তা...আবেদা আপা পাস করেছে তো? ও তো আমার চেয়েও মেধাবী ছাত্রী। দেখতে সুন্দর।'

ফারুক অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরল, কথা শেষ করতে দিল কেকাকে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, 'আবেদা আলমগীর খান! উনি তো এ-ঘরে আসেননি! ইন্টারভিউ দেবার প্রশ্ন উঠছে কেন?'

কেকা বিব্রত মুখে ফারুকের দিকে তাকিয়ে আছে। ফারুকের পক্ষে এই রহস্যের তল পাওয়া একটু কঠিন। সে বলল, 'উনি অবশ্য আসতে চেয়েছেন, দরজায় পৌঁছতেই আমি বলেছি, ''আপনাকে নয়, কেকাকে আসতে বলেছি। নাজমা বোধহয় বুঝতে পারেনি। আপনি বিষম ব্যস্ত।

আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।" শুনে উনি চলে গেলেন।'

কেকা আর কিছু বলল না। ঘরের চারদেয়ালে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। খাটের পাশে মস্ত রেকর্ড প্লেয়ার, তার পাশে স্লিম-গোছের শোকেস। কথাটা ভেবে কেকার হাসি পায়। বড়লোকের ঘরের রোগা-ভোগা জীর্ণশীর্ণ ছেলেমেয়েদের বলা হয় স্লিম; কখনই রোগা নয়। জীর্ণ, দুবলা বলা হয় গরিবের সন্তানকে। ভাষার রাজত্বে এইরকম শ্রেণীচেতনা তার মধ্যেও আছে। ফারুকের ঘরের চকচকে, সরু শোকেসটাকে শীর্ণ না বলে বলতে ইচ্ছে করছে স্লিম। শোকেসের ভিতরের জিনিসগুলো অবশ্য খুবই হৃষ্টপুষ্ট আর সমৃদ্ধ। অনেকগুলো রেকর্ড—সুন্দর সুন্দর মলাটে ঢাকা। কয়েকটা ট্রফি আছে; বেশির ভাগই ফারুকের; খেলাধুলায় জিতে পাওয়া। কবে যেন ইতালি আর বুলগেরিয়ায় গিয়েছিল, সেসব দেশের নানান স্মৃতিচিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির পাশে শান্তিনিকেতনের চমৎকার একটা সুভ্‌নীয়র। কবির হাতে লেখা কবিতার আলোকচিত্র:

"অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
জীবন কেবলই খোঁজা।
অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা।
যা পাইনি তারি লইয়া সাধনা
যাব কি সাগরপার?
যা গাইনি তারি বহিয়া বেদনা
ছিঁড়িবে বীণার তার?"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা কেকা আগে পড়েনি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েকবার পড়ল। সুভ্‌নীয়রের পাশে গোলাপি কাপড়ে ঢাকা একটি বস্তু। কী, ঠিক বোঝা

যাচ্ছে না। ফারুক কেকার দৃষ্টি অনুসরণ করে।

'জিনিসটা ঢাকা আছে বলে কৌতূহল হচ্ছে?'

ফারুকের স্বরে চাপা কৌতুক কেকার কান এড়ায়নি। সে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'না, আমার মধ্যে কৌতূহল জিনিসটা খুব কম।'

ফারুকের চোখে আরও মেঘ জমে; ঘোর করে আসে। যে যত বেশি পায় তার তত হারানোর ভয়। কিন্তু যে শুধু পাবার আশা পেয়েছে, তার হারানোর ভয় তো আশঙ্কা নয়, রীতিমত আতঙ্ক।

'কফি খাবেন?'

কেকা ফারুকের ঘরটা দেখতে দেখতে গান শুনছিল। 'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী...'

'কফি? না, থাক। এইমাত্র চা খেয়েছি।'

'চা খেয়েছেন, তাতে কি? আমি চমৎকার কফি বানাই। এক কাপ খেয়েই দেখেন না!'

কেকা হেসে ফেলল। 'নিজের দইকে কোন গোয়ালা খারাপ বলে?'

ফারুক ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল। বইয়ের শেলফের প্রান্ত থেকে হাতড়ে খুঁজে বার করল দুটো কাপ। খাটের বক্স থেকে কফি ব্লেণ্ডার আর রাইটিং ডেস্কের নিচে থেকে পাওয়া গেল চিনি, দুধের কৌটো। শেষ মুহূর্তে মনে পড়ল, কফির কৌটো কেকা যেখানে বসে আছে তার পিছনে।

কেকার দিকে তাকায় ফারুক। তনু নিয়ে কলজে-কাঁপিয়ে-দেয়া মুদ্রা তৈরি করে বসে আছে সেই কোমলিনী ডমরুমধ্যমা। ফারুক ছবি আঁকতে জানে না। ক্যামেরা নেই হাতের কাছে। তা ছাড়া ছবি তুলতে চাইলেই সে কিছু গদগদ চিত্তে রাজি হয়ে যাবে না। তার চেয়ে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' চেয়ে চেয়ে দেখাই ভাল। আরও ভাল স্বপ্ন দেখা।

ভাল তো। কিন্তু কফির কী হবে?

কেকা নড়ে বসল। 'ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল ফারুক। বরারোহা মূর্তি ভেঙে গেছে। এবার স্বপ্ন কিংবা ললিতকলা ছেড়ে বাস্তবে ফিরে আসা যায়।

ফারুক বলল, 'আপনার পিছনদিকটায় আমার কফি আর কফিমেট।'

দ্রুত সরে বসতে গিয়ে দুলে উঠল কেকার সুগঠিত তনু, তার চেয়ে বড় দোলা লাগল ফারুকের বুকের গভীরে। কফি আর কফিমেট বার করে নিয়ে মিনতির স্বরে বলল, 'আগে যেভাবে বসে ছিলেন, ওভাবেই থাকেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কফি তৈরি হয়ে যাবে।'

কেকা বলল, 'আপনি তো কষ্ট করে কফি বানিয়ে খাওয়াচ্ছেন। আমাকে একটা কষ্ট করার সুযোগ দেন।'

'আপনি আবার কী করতে চান?'

'আপনার ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে। একটু গুছিয়ে দিই।'

ফারুকের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কঠিন কাজ। আজ থাক।'

কেকা ফড়িং-এর গতিতে উঠে দাঁড়াল। আঁচল পেঁচিয়ে নিল বুকের ওপর। তাতে ওর বুকের ঔদার্য উচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হলো আর ফারুকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই কেকার।

'কঠিন কাজ, তাতে কি? আমি চমৎকার ঘর গুছাই। ঘরটা একবার আমার হাতে ছেড়ে দিয়েই দেখেন না! পাঁচ মিনিটও লাগবে না।'

গম্ভীরভাবে 'পাস' দিতে চেয়েছিল ফারুক। হলো না, হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে।'

কফি বানাতে ফারুকের লাগল দশ মিনিট। ঘর গোছাতে অন্তত পনেরো মিনিট দরকার। কিন্তু দু'কাপ কফি নিয়ে ফারুক যখন দরজায় উঁকি দিল, কেকা তখন রুদ্ধ বিস্ময়ে বাক্‌হারা হয়ে তাকিয়ে আছে আইভরি মূর্তির দিকে। এবার অনেক রহস্যের কিনারা করতে পারছে

কেকা। ফারুকের এই অপ্রত্যাশিত নিবেদন আর কৌতূহল, ঢাকায় করিম খান আর আইরিনের চোখের ঝিলিক, ছন্দা ভাবীর বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠতা— সবকিছুর অর্থ পাওয়া যাচ্ছে।

সত্যি, মূর্তির ওই মুখ তার মত। আয়নায় নিজের মুখ দেখা আর আইভরি মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকা একই কথা মনে হচ্ছে কেকার। ঘরের অন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে এনেছিল সে; শুধু খাটটা বাকি। শো-কেসের জিনিসগুলো সাজাতে গিয়ে খসে যায় গোলাপী ঢাকনা। তারপর এই বিস্ময়।

কফির কাপ বাড়িয়ে ধরে ফারুক বলল, 'বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে সারাজীবন খুঁজে বেড়াচ্ছি এই মানবীকে। মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথই ঠিক বলেছেন, জীবন কেবলই খোঁজা।'

কাঁপা কাঁপা গলায় কেকা বলল, 'আজও পাননি?'

'পেয়েছি।'

কেকার মুখে সন্ধ্যাকাশের লালিমা ছড়াল। 'তা হলে আর "জীবন কেবলই খোঁজা" সত্যি হলো কীভাবে?'

'খুঁজে পাওয়া আর নিজের করে পাওয়া কি এক কথা?'

স্বপ্নের শেষভাগে এসে মানুষের যেমন হয়, সত্যি না মিথ্যে, বুঝে ওঠার আগে স্বপ্ন ভেঙে যায়—তেমন অবস্থা কেকার। ফারুকের কথার আসল মানে বুঝে উঠতে না উঠতে দরজার পরদা প্রবলভাবে দুলে উঠল।

'আসব, ভাই লক্ষ্মণ?'

ছন্দা কতক্ষণ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বোঝার উপায় নেই। ছন্দার কথা শুনে মনে হলো সবটা না হলেও অনেকটা শুনেছেন। ঘরের ভিতরে ভালভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। 'মা গো মা! এরই মধ্যে এতখানি! মেয়ে যে আমার বাউণ্ডুলে দেবরের ঘরের

চেহারা পালটে দিয়েছে!'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল ফারুক। 'কী মতলবে এসেছ, ভাবী?'

ছন্দা ভাবীর চোখে বিচিত্র কৌতুক। 'মিসেস আবেদা আলমগীর খান ধরেছেন, রূপদিয়ার রাজবাড়ি যাবেন।'

'বেশ তো, নিয়ে যাও!'

'আমি না, তুমি নিয়ে যাবে। তোমাকে বলতে সাহস পাচ্ছেন না।'

এক মুহূর্ত ভাবল ফারুক। 'উনি একাই যেতে চান?'

ছন্দা দাঁতে জিভ কেটে বললেন, 'ও মা, তা কেন? আমাদের আসল অতিথি কি একা বাগানবাড়িতে ভেরেণ্ডা ভাজবে?'

আট

সবটা পথ মোটরেব্‌ল্ নয়। হাইওয়েতে গাড়ি থেকে নেমে মাইলখানেক হাঁটতে হলো। প্রকাণ্ড এক দিঘির প্রান্তে এসে ফারুক বসে পড়ল এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ওপর। 'এই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক রাজবাড়ির প্রবেশপথ।'

আবেদার ক্যামেরা বারকয়েক ঝিলিক দিয়ে উঠল। ফারুক বলল, 'কী হলো, ম্যাডাম অ্যানথ্রোপলজিস্ট? আপনি তো শুধু আমার ছবিই তুলছেন। আমার চেহারা তো ঐতিহাসিক নয়, আপনার গবেষণার কী কাজে আসবে?'

'কি যে বলেন! আমি তো ওই ধ্বংসস্তূপের ছবি তুললাম। ড. মফিজউদ্দীন সাহেবের বইয়ে এই স্পটের বর্ণনা আছে। আমার রিপোর্টে বর্ণনার সঙ্গে ছবি থাকবে, নতুন কিছু তথ্যও থাকবে। আর এতসব প্রেজেন্টেশনের কৃতিত্ব তো আমার একার নয়। তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্যে আপনার ছবিও তুলছি। ওই মান্দার গাছটার নিচে দাঁড়ান তো! চমৎকার আসবে ফটো।'

হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল ফারুক। 'রক্ষে করুন। রিপোর্টে আমার ছবি কিংবা নাম— কোনটাই ব্যবহার করবেন না। তাতে প্রমাণ হবে, আপনি গবেষণা করতে আসেননি এখানে, এসেছেন আমার সঙ্গে রোম্যান্স করতে।'

আবেদা বিজয়িনীর ভঙ্গিতে কেকার দিকে তাকায়। তার মানে কেকা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, ফারুকের মনের গোপন কথা ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। কেকা একটা খোঁচা দেবার সুবর্ণ সুযোগ পেল। সেটা হেলায় হারাতে চায় না সে।

'ছবিগুলো নিশ্চয় তুমি হাসান ভাইকে দেখাবে না!'

আবেদার মুখে একটা নিষ্ঠুরতার ছায়া পড়ল। 'দেখালেই বা কি? আমি কি কাউকে কিছু পরোয়া করি?'

ফারুক পিঠ চাপড়ানোর ভঙ্গি করে বলল, 'না, না, পরোয়া করবেন কেন? "বীরাঙ্গনা" শব্দটা ডিকশনারির মালিকানা থেকে বেহাত হয়ে গেছে। নইলে আপনাকে ওই বিশেষণটা দেয়া যেত।'

পরিস্থিতি সুবিধের নয়। কেকা আবেদার মুখের দিকে তাকিয়ে অশুভ সঙ্কেতের উপস্থিতি টের পায়। দুর্যোগ কেমন হবে সে জানে না, তবে মনে হলো, সেখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরে পড়া ভাল।

দিঘির কোল ঘেঁসে হাঁটতে থাকে কেকা। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। নীল জলে সাদা-কালো ঢেউয়ের বিচিত্র মিলন তার চোখে নেশা এনে

দেয়। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়? ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় না? সাঁতার জানে না কেকা। নইলে কি আর অপেক্ষা করত?

আহত দৃষ্টিতে আবেদা তাকিয়ে আছে ফারুকের দিকে। ফারুক হাসল। 'রেগে গেছেন মনে হচ্ছে। খারাপ কিছু বলেছি নাকি?'

ফুঁসে উঠল আবেদা। 'আপনারা পুরুষ জাতি এইরকমই।'

'এইরকমই মানে!'

'নারীদের মানসিক নির্যাতন করা, তাদের স্বাধীনতা হরণ করা, তারপর আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ী হাসি দেয়া।'

মুখ থেকে হাসি নিবিয়ে ফেলল ফারুক। সম্ভবত গোলমালের আঁচ অনুমান করে আইভরি মূর্তি সরে পড়েছে। কিন্তু কতদূরে গেল সে? হারিয়ে যাবে না তো আবার? দিঘির ওই ধারটায় পুরানো মন্দির, দুর্গম ঝোপঝাড়ও আছে। বহুদিন ওসব জায়গায় মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে না। সাপ-খোপ স্বাধীন, সার্বভৌম রাজ্য গঠন করেছে। চঞ্চল চোখে সে অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

'কে আপনার স্বাধীনতা হরণ করছে?'

আবেদা ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'শুনলেন না আমার গাইড-কাম-কাজিনের কথা! আপনাকে-আমাকে জড়িয়ে দশটা মিথ্যে অপবাদ তুলে দেবে হাসানের কানে। আর হাসানকে তো আপনি চেনেন না! কী যে অশান্তি হবে!'

'আপনি তা হলে অশান্তির ভয় পান। মানে পুরোপুরি বীরত্ব দেখানোর কথা ভাবতে পারছেন না।'

'কেবল কথায় কথায় টীজ করছেন কেন?'

ফারুক বলল, 'টীজ করছি না। ভাবছি হাসান সাহেবের কথা। বেচারা বউকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে লেখাপড়া, রিসার্চ, যার সঙ্গে খুশি

ফটো তোলা, এই সব কাজের জন্যে। নিজে একা কষ্ট করছে। আর বউ কিনা...'

বাধা দিল হাসান সাহেবের বউ। 'আমি মহাভারত অশুদ্ধ হবার মত কোন কাজ করছি না। আমি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করি। আমি শুধু একজনের মধ্যে ভালবাসা সীমাবদ্ধ রাখার পুরানো বস্তাপচা নীতিতে বিশ্বাস করি না। আমি চাই অনেক বন্ধুত্ব, অনেক ভালবাসা। আমি অনেক মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই। তাদের সুখ-সুবিধা, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হতে চাই। এতে অন্যায়ের কী আছে, বলেন তো?'

বাবলার জঙ্গলের ফাঁকে কেকার সাদা কামিজ আর প্রথম প্রেমের মত দুরু-দুরু কাঁপতে থাকা ওড়নার আভাস দেখতে পেল ফারুক। ওই বন্যানীর হৃদয়পুরে নিঃসঙ্গ আইভরী মূর্তিকে ঠিক মানাচ্ছে না। সে দুর্বার আকর্ষণ বোধ করল ওই জায়গাটার জন্য। দুর্নিবার হয়ে উঠল আইভরি মূর্তির সঙ্গ। কিন্তু তার আগে এই মূর্তিমতী সমস্যাটাকে কাটানো দরকার।

ফারুক মেঘ গর্জনের শব্দে বলল, 'আপনি নিজেকে বুঝতে পারেন না। জানেন না, নিজে কি চান।'

'জানি না মানে! আমি এমন কিছু দিল্লির লাড্ডু চাই-না। আমি চাই অনেক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। আমি এই পৃথিবীর সব মানুষকে ভালবাসি।'

'অসম্ভব!'

কথাটা এত জোরে বলল ফারুক যে আবেদা তো ঘাবড়ালই, সে নিজেও একটু বিব্রত হলো। আত্মপ্রত্যয়ী আর বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষেরা চিৎকার-চেঁচামেচি করে না, ওগুলো কাপুরুষের কাজ।

'কী অসম্ভব?'

ফারুক বলল, 'আপনি শুধু নিজেকে ভালবাসেন। আত্মপ্রেমের আলোয় পৃথিবীকে দেখেন বলেই ওইসব উদ্ভট ধারণা আপনার মাথায় খেলা করে।'

আবেদার স্বর শরবিদ্ধ পাখির ডাকের মত মনে হয়। 'আপনি··· কীভাবে আমার সম্পর্কে···এমন নিশ্চিত মন্তব্য করছেন? আমার কী জানেন আপনি?'

হাসল ফারুক। 'শোনেন। মানবচরিত্র যে জানে, সে মানুষের মুখ দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারে।'

'আমার সম্পর্কে আর কী জানেন আপনি?'

'সব কথা আপনাকে বলব না। কয়েকটা বলব, মিলিয়ে দেখবেন।'

'বেশ।'

'আপনি একটানা বেশিক্ষণ আপনার স্বামীর সঙ্গ সহ্য করতে পারেন না। দিনের বেশির ভাগ সময় আপনার নিজের পছন্দের জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করেন। প্রিয় বই, প্রিয় খাবার, প্রিয় পোশাক, প্রিয় খেলনা।'

রুদ্ধশ্বাসে আবেদা জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'আপনার সন্তান আকাঙ্ক্ষা নেই। থাকলেও তার জন্যে বিশেষ তাড়া নেই। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না, স্বাভাবিক নারীর সবচেয়ে তীব্র আর আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা তার সন্তান।'

'আর প্রেমিক বা স্বামী—?'

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল ফারুক। গাঢ় সবুজ সমুদ্রের বুকে একটি পাল তোলা জাহাজের মত খাবি খাচ্ছে সাদা কামিজ। কী খোঁজে সে?

'স্বামীকে ঠিক প্রেমিক ভাবেন না আপনি। হাসান সাহেবের সঙ্গে আপনার দু'ধরনের সম্পর্ক আছে। একটি সামাজিক, অন্যটি···জৈবিক।'

দিঘির পাড় ঘেঁসে হাটতে থাকল ফারুক। কেকা যেদিকে গেছে

তার বিপরীত দিকে। কেকার পথের দিকে পা বাড়ালে আবেদা পিছু ছাড়বে না, বুঝতে কিছু বাকি নেই ফারুকের। বিপরীত দিকে গেলে তার সন্দেহের আওতা ছাড়ানো যেতে পারে। নাহ, এই মহিলাকে যশোরে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করেছে সে। কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য উপায়ও ছিল না। আইভরিওয়ালী যদি মাথা হয়ে থাকে আবেদা ছিল কান। মাথা আনার স্বার্থে কান টানতে হয়েছে।

আবেদা ঝিমম হাঁপাচ্ছে। নানান জিনিস মানুষের শরীরে-মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। আবেদার উত্তেজনার জন্য কী দায়ী? ফারুক তার সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে? ভয় পেয়েছে আবেদা? সম্মোহিত হয়ে পড়েছে তার দুর্লভ গুণে? অথবা শুধুই রাগ, নিষ্ফল রোষ, অক্ষমের আর্তনাদ?

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'দিঘির ওই পাড়ে। আপনি ওই শিলালিপিগুলো স্টাডি করেন। কাজে লাগবে। কেকা ফিরে এলে এখানে অপেক্ষা করতে বলবেন।'

শেষের কথাটা শুধু বলার জন্য বলা। ফারুক জানে, কেকা তার জন্য অপেক্ষা করছে ভাঙা মন্দিরের পিছনে। মানুষের মন তার নিজের কাছে কত বড় বিস্ময়, ভেবে পাওয়া যায় না।

নীরব, নির্জন এলাকা। পাখির অবিশ্রান্ত ডাক আর গাছের পাতায় বাতাসের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নিজের নিঃশ্বাসের সবটুকু শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহরের জনারণ্যে কি বাড়ির কোলাহলে এই শব্দের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। শুধু কি এই শব্দ? নিজের অস্তিত্বের অনেকটাই তো গোপন থাকে শব্দমুখর দৈনন্দিন জীবনে। নিজেকে খুঁজে পাবার অবসর আর মেলে কই? নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় এই এখানে। সভ্যতার অভিশপ্ত শব্দ দূষণ থেকে অনেক দূরে। ফার ফ্রম দ্য ম্যাডেনিং ক্রাউড।

মন্দিরের পিছনে একটা ভাঙাচোরা ঢিবির ওপর দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে। মূর্তি সেখানে মূর্তি হয়েই বসে আছে। রবীন্দ্রনাথের গান আছে না? 'ওগো শান্ত পাষাণ মূরতি সুন্দরী···'

ঠিক এইরকম পরিবেশে এইরকম কাউকে দেখে গানটা রচনা করেছিলেন নাকি কবিগুরু? এইভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন? তারও কি হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল ভেসে গিয়েছিল? হেমন্তে তার বুকের তলা ভরে স্বনিত হয়েছিল কোন বসন্তের বাণী?

কেকা ফিরে তাকাল না। যেন সে ধরে নিয়েছিল, অমোঘ নিয়তির মত ফারুক এসে পিছনে দাঁড়াবে। ফারুক পিছন থেকেই কেকার মুখে রহস্যময় হাসি দেখতে পায়।

'এ-মূর্তি তো আপনার না, ফারুক সাহেব! আপনারটা আছে আপনার ঘরেই, গোলাপী কাপড়ে ঢাকা।'

ফারুক বলল, 'কোন মূর্তিই কারুর নিজের নয়। মূর্তি সবসময়ই অন্যের। মালিকানার হাতবদল হয়, চুরি হয়ে যায়, আরও কত অদলবদল হয়। মাদাম তুসোর ভুবনবিখ্যাত মোমের মূর্তির কথা শুনেছেন?'

'হুঁ।'

'তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত মূর্তিটি একবার চুরি হয়ে যায়। কে এক সেয়ানা চোর আসল মূর্তি সরিয়ে রেখে যায় নকল একটা।'

ঘুরে বসল কেকা। তার কয়েক গোছা দীর্ঘ আঁকাবাঁকা চুল হারিয়ে যাওয়া পথের মত চলে গেছে মুখের পাড়া দিয়ে। বিরহবিধুরার মত দেখাচ্ছে তাকে।

'কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

ফারুক এক সেকেণ্ড অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কোনটা সত্যি।'

'কোনটা সত্যি মানে!'

'মুখের কথাটা না মনের সুরটা?'

কেকা হাসল। 'আপনি আমার চেয়ে আরও দুরূহ, দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে আটকা পড়েছেন। জীবন্ত মূর্তির আশা ছেড়ে দেন। মানে···বলতে চাই···যদি সত্যি কিছু আশা করে থাকেন।'

'ছেড়ে দেবার মত আশা আমি করি না, কেকা শাহীন। আর ভুল করে কিছু চাই না। যা চাই, জেনেশুনে, ভেবেচিন্তে চাই। আপনার চেয়ে আরও দুরূহ রহস্যের কথা বলছেন। কার কথা বোঝাচ্ছেন? মিসেস আবেদা আলমগীর খান? উনি একটুও রহস্যময়ী নন, জাস্ট একজন ছলনাময়ী। স্বামীকে ছলনা করছেন, স্বাভাবিকভাবে আমাকেও করবেন। ওনার সব ব্যাপার পরিষ্কার।'

এই রূঢ় সত্যি কথাগুলো শোনার আশা করেনি কেকা। ধরা গলায় বলল, 'আপনি কিছু মনে করেননি তো? আমার কথায় নিশ্চয় জেলাসি প্রকাশ পেয়েছে!'

ফারুক হেসে তার কাঁধে হাত রাখল। 'না।'

দিঘির ওপর বাতাসের কামনা বড় বড় ঢেউয়ের জন্ম দিচ্ছে। কোত্থেকে যেন উড়ে এল একজোড়া মাছরাঙা। কাঁধের ওপর একটি হাত নেমে এসেছে স্বপ্নের মত। সব মিলিয়ে এত সুন্দরের ভার সহ্য করার ক্ষমতা নেই কেকার। সে চোখ বন্ধ করল।

নয়

ফারুক সেই যে সকাবেলা নাশতার পর বেরিয়েছে, তার আর ফেরার নাম নেই। হরিণার বিল থেকে কৈ মাছ সংগ্রহ করে আনিয়েছেন ছন্দা। পাপলু আর টুসি অনেকদিন থেকে আবদার করছিল। ওই মাছের ওপর তাদের চাচার লোভও কম নয়। ছন্দা আজ নিজে রান্না করেছেন। অতি চমৎকার হয়েছে পদটা। তা ছাড়া নারিকেলের ফালি দিয়ে মুরগি করেছেন, গজাল মাছ আর মেটে আলুর প্রিপারেশনও খারাপ বলা যাবে না। ভর্তা আর সালাদ তো আছেই।

সকাল সকাল রান্না শেষ করে টেবিল সাজিয়েছেন ছন্দা। পাপলু-টুসিকে নিয়ে পুকুরে গেছেন। গোসল সেরে উঁকি দিয়েছেন লাইব্রেরিতে। বিষম বিরক্ত মুখে পুরানো বইপত্রের পাতা ওলটাচ্ছে আবেদা। সামনে একতাড়া কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে ফাউন্টেন পেন; উদারভাবে কালি ঢালছে। প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখে মনে হতে পারে, আবেদা গবেষণার নোট নেবার বদলে ছবি আঁকছে। তামসী তর্মস্বিনী।

ছন্দা ধীরে ধীরে পা বাড়ান। গিয়ে দাঁড়ান আবেদার পিছনে। 'কী আঁকছেন? অমাবস্যার রাতের ছবি?'

আবেদা চমকে ফিরে তাকায়। 'ও, আপনি! এ-ঘরে ঢুকেছেন কেন? ফারুক সাহেবের বারণ আছে না?'

ছন্দা বিষম অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু মনোভাব চেপে হাসিমুখে বলেন,

'ভাত খাওয়ার সময় হয়েছে। খাবেন কি না জানতে এলাম।'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে আবেদা। 'ফারুক সাহেব ফিরেছেন?'

'না। মনে হচ্ছে আজ ওনার দেরি হবে।'

একটু দ্বিধার পর উঠে পড়ল আবেদা। 'তা হলে চারটে খেয়ে নিই, প্রায় দুটো বাজে। ফারুক সাহেব ফিরলে না হয় আবার বসা যাবে।'

ছন্দা মুখ ঘুরিয়ে রেখে বললেন, 'আপনার ইচ্ছে।'

কেকার ঘরে গিয়ে ছন্দা দেখলেন, গভীর মনোযোগে 'জুলাইয়ে পিপল' পড়ছে। 'কী গো, সুন্দরী, খাওয়ার ইচ্ছে আছে?'

কেকা বইটা উলটে রেখে বলল, 'আরও একটু দেখি—'

ছন্দা কেকার পাশে বসে তার গাল টিপে দেন। 'ও ব্বাবা! এ যে দেখছি সতী সাবিত্রীর পতিভক্তি!'

হাসল কেকা। 'কি যে বলেন! পতিরই দেখা নেই, তা আবার ভক্তি!'

'বেশি ধান্দা কোরো না, মেয়ে। ভাল চাও তো ঝটপট ঝুলে পড়ো। পরে কিন্তু পস্তাবে। এখন আমি কাছে আছি। বিপদে-আপদে ডাকলে পাবে।'

'ভাল হচ্ছে না, ছন্দা ভাবী। জ্বালাতন করলে আমি কিন্তু পালাব।'

ছন্দা সস্নেহে কেকার কাঁধে হাত রাখেন। 'যে বেশি জ্বালায় তার জ্বালাতন বুঝি বেশি মধুর! তখন যে পালানোর নাম মুখে আনো না!'

'কেউ আমাকে বেশি জ্বালাতন করে না। সাহসই রাখে না।'

চোখ বড় বড় করে তাকালেন ছন্দা। 'ও মা, তাই নাকি? এত যে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা, এত যে গান শোনাশুনি, সব তা হলে ভুয়া?'

কেকা হাসল। উত্তর দিল না।

তার কানের কাছে মুখ রেখে ছন্দা ফিসফিস করে বললেন, 'আমাদের রাজপুত্তুরটিকে তোমার মনে ধরেনি, সুন্দরী?'

কেকা গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমাকে লোভ দেখাবেন না, ভাবী। আমি গরিব ঘরের সাধারণ মেয়ে। ফারুক সাহেব তো···আমার কাছে··· ইতিহাসের চরিত্র। ওঁকে আমি দূর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারি, বন্ধুত্ব রাখতে পারি, হয়তো···ভালও বাসতে পারি। কিন্তু খুব ভাল করেই জানি ওঁর স্ত্রী হিসেবে আমি বেমানান। এটা হতেই পারে না, ভাবী।'

'পাগলি! আচ্ছা, দেখা যাবে। এখন চলো, তোমার চুল বেঁধে দিই।'

আবেদা খাওয়া সেরে ফিরে এল। নিজের কামরায় যাবার আগে ঢু দিল কেকার ঘরে। 'বাহ, জমিয়ে আড্ডা দেয়া হচ্ছে, না?'

ছন্দা বললেন, 'আপনিও জমাতে পারেন ইচ্ছে করলে। বসেন।'

'আমি আর বসে কী করব? কে আমার চুল বেঁধে দেবে? সবাই কি আর সৌভাগ্য নিয়ে জন্মায়? ভাগ্য হচ্ছে···ওই যে···একটা কথা আছে না?'

যে-কথাই থাক, শোনার ইচ্ছে নেই ছন্দার। বিরক্তি চেপে রেখে বললেন, 'বসেন। আপনার চুলও বেঁধে দিচ্ছি।'

আবেদা বলল, 'কেকা, তোমাকে বলেছিলাম না, আমাদের ছন্দা ভাবীর মত মানুষ হয় না। এই মহিলার যে কত গুণ, বলে শেষ করা যায় না। এত সম্পত্তি···এত বড় বাড়ি···লোকজন···সব সামলাতে হয় ওনাকে...'

পাপলু ছুটতে ছুটতে ঢুকল। 'মা, তোমার ফোন।'

ছন্দার মনটা আর ভাল নেই। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কে?'

ছেলে বলল, 'কে, জানি না। ঢাকা থেকে।'

করিম খানের স্বর শুনে আশ্বস্ত হন ছন্দা। 'কেমন আছেন, ভাবী?'

'ভাল। আপনারা?'

'আইরিনের গ্যাস্ট্রাইটিস বেড়েছে, অন্য সব খবর ভাল।'

ছন্দার গলায় উদ্বেগ স্পষ্ট হয়। 'গ্যাস্ট্রাইটিস বাড়ল কেন?'

'টেনশনে।'

'কিসের টেনশন?'

করিম খান হাসলেন। 'জানেন না? ভাইয়ের রাজকন্যে জয়ের ব্যাপারে বিষম টেনশন হচ্ছে আপনার ননদের। তার ধারণা মেয়েটি...মানে ওই যে...আইভরিওয়ালী...'

'ওর নাম কেকা শাহীন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেকা শাহীন...সে এই বিয়েতে রাজি হবে না।'

ঢোক গিললেন ছন্দা। 'আমার ননদ তো। মাথায় ঘিলু থাকবেই।'

'তার মানে ওর অনুমান সত্যি?'

'এখনও সত্যি বলেই মনে হচ্ছে।'

করিম সাহেবের স্বর অসহিষ্ণু শোনাল। 'তা...আপনি কী করছেন? দেশের লোক নর্থ পোলের পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে সাউথ পোলের ওনাদেরকে মিলিয়ে দিল। আপনি দুই ওপন্ চেম্বার পাত্রপাত্রীর মধ্যে ইয়ে ঘটিয়ে দিতে পারছেন না?'

ছন্দা অতি কষ্টে হাসির বেগ সামলান। 'আমি তো...চেষ্টা করছি, ভাই। মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি বলে কিছু নেই। নীতিজ্ঞান টনটনে।'

'কী বলে সে?'

'কী আবার বলবে? সে নাকি ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে। রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে জীবন সুখের হবে না।'

'যত্তসব! শোনেন, ভাবী। আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। কেকা আসলে বিনয় করছে, কিংবা দাম বাড়াচ্ছে। ওদের বাড়ির অবস্থা খারাপ না। হয়ও যদি, সেটা আমাদের মাথাব্যথা। ওকে বলেন নিজেকে সিনডারেলা ভাবার কোন দরকার নেই। একান্তই যদি টাকাপয়সা দেখে ওর ভয় লাগে, আমরা না হয় ফারুকের ব্যাঙ্কব্যালান্স সব সরিয়ে ফেলব অন্য অ্যাকাউন্টে।'

ছন্দা নিচু স্বরে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরতে হবে, ভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

'এসব ব্যাপারে বেশি অপেক্ষা করা ভাল না, ভাবী। যা করবেন, তাড়াতাড়ি। আর আমাদের যাজপুত্তুর কী বলে?'

'ভরা গাঙের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেদিন দেখি গভীর রাতে একা পায়চারি করছে ছাদে, ভূতের মত।'

'ভেরি স্যাড। একটা বুদ্ধি দেব, ভাবী?'

করিম খানের স্বরে এক ধরনের কৌতুক ফুটে উঠেছে। তাঁর এই স্বরের সঙ্গে ছন্দার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ওঁর মুখে কিছু আটকায় না। কি না কি বলে বসবেন কিছু ঠিক নেই।

ছন্দা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ফাজলামো করবেন না তো?'

'তা···একটু আদি রসাত্মক তো হতেই পারে। শোনেন। দু'জনকে···'

ছন্দা তাড়াতাড়ি কাট-ইন করলেন। 'না, ভাই, আপনার আল্লার কিরে, আর একটু সময় দেন আমাকে। আমি বরং বাড়তি খানিকটে স্নেহরস ঢেলে দেখি, কিছু করা যায় কি না।'

করিম খানের গলায় গাম্ভীর্য ফিরে আসে। 'দেখেন। কিন্তু একটা কথা, ভাবী—'

'বলেন।'

'দিস ইজ হাই টাইম। এই মেয়েটার সঙ্গে যদি কোনরকমে জড়িয়ে দিতে পারেন, ভাল। নইলে···আমার ধারণা, ছোকরা আর কখনও বিয়েতে রাজি হবে না। যাক গে, আবেদার গবেষণা কেমন চলছে?'

'আমার তো মনে হয়, ভালই চলছে।'

'পাপলু আর টুসি ভাল তো?'

'জ্বি, আপনাদের দোয়া।'

রিসিভার ক্রেডলে রেখে কেকার কামরায় ফিরে আসেন ছন্দা। আবেদার চোখে নীরব জিজ্ঞাসা। ছন্দার মুখে লালিমা লেগে আছে।

হঠাৎ মাথায় কেমন যেন রোখ চাপে, ছন্দা বলে ফেলেন, 'হাসান সাহের ফোন করেছিলেন।'

ভ্রূ কুঁচকে আবেদা বলল, 'হাসান ঢাকায়?'

ছন্দা বুঝতে পারেন, সামান্য গোলমাল হয়ে গেছে। কিন্তু জলে পা ডুবিয়ে তো আর শুকনো শরীরে ফিরে আসা যায় না। 'হ্যাঁ, হঠাৎ কি একটা কাজে। পাশেই এক মহিলার গলা শোনা গেল।'

আবেদার চোখ আগেই কুঁচকে ছিল, এবার কপালও কোঁচকান। 'মহিলা!'

ছন্দা আমতা-আমতা করে বললেন, 'হ্যাঁ, ওনার বিজনিস পার্টনারের ওয়াইফ। তাকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় গিয়েছেন। আমি তো আর এত ভিতরের খবর নিতে পারি না। হয়তো একা থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছেন বেচারা।'

আবেদা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছন্দা যখন চিরুনি তুলে নিয়ে কেকার পিছনে গিয়ে বসেছেন, তখন ধীরে ধীরে বলল, 'তা....আমার কথা জিজ্ঞেস করল না?'

'হ্যাঁ, করলেন। বললাম, কাজ তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে। তবে আরও কিছুদিন দেরি হবে। শুনে উনি হাসলেন।'

'কিছু বলল না?'

'হ্যাঁ, বললেন, এত তাড়াহুড়ার কী আছে? এসব কাজে সময় লাগেই।'

ভিতরে ভিতরে ঘামছেন ছন্দা। এতগুলো মিছে কথা একটানা বলে যাওয়া খুবই কষ্টের। কিন্তু সে-কষ্টের হাত থেকে দ্রুত মুক্তি পেলেন ছন্দা। কান্না আসছে আবেদার। ঢাকার জন্য উঠে পড়ল সে। কয়েক

সেকেণ্ডের মধ্যে ওদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। নারীর হৃদয় দিয়ে ছন্দা অনুমান করতে পারেন, বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে।

কেকা বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ভাবী?'

'একশোটা জিজ্ঞেস করতে পারো, সুন্দরী।'

'আবেদা আপাকে আপনি একটুও পছন্দ করেন না, তাই না?'

'কেমন করে বুঝলে?'

'এই যে একটা ঝাড়া মিথ্যে খবর দিলেন!'

কেকার চুলের অরণ্যে সজোরে চিরুনি চালালেন ছন্দা। 'কি সেয়ানা মেয়ে রে, বাবা! এত দূরে বসেও টের পেয়েছ?'

'সে-কথা নয়। আমি জানি, কে টেলিফোন করেছিলেন।'

চিরুনি থেমে গেল। 'কচু জানো।'

'বলব? করিম ভাই।'

ছন্দা দৃশ্যত ঘাবড়ে গেলেন। 'সই, তুমি ডাইনী-টাইনি নও তো?'

'না, ভাবী। আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে আইরিন ভাবী টেলিফোন করেছিলেন। কোন বিশেষ খবর ছিল না। আমাদের...মানে বিশেষ করে আমার খোঁজখবর নিলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন করিম ভাই টেলিফোন করেছেন কি না। বললাম, "না তো!" উনি অবাক হয়ে বললেন, "এখনও করেনি! তা হলে নিশ্চয় লাইন পাচ্ছে না।" এখন ঢাকা থেকে কল এসেছে শুনে...'

ছন্দা বাধা দিয়ে বললেন, 'দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছ, তাই তো? এবার বলো তো, খুকি, আমাদের হিসেবটা মিলিয়ে দিচ্ছ না কেন?'

চুল বাঁধা হয়ে গেছে। ঘুরে বসল কেকা। মুখে দুর্ভাবনা আর আনন্দের মিলিত ছবি। 'আপনাদের হিসেব যে বড় কঠিন, ভাবী।'

দশ

অন্ধকার নেমে আসছে— ঠিক যেমন করে গ্রেসফুল ভঙ্গিতে সিনেমার নায়ক-নায়িকা নেমে আসে ওপরতলার সিঁড়ি বেয়ে, কিংবা, এয়ারক্র্যাফট থেকে জাতীয় নেতা-নেত্রীরা। কেকা অনেকক্ষণ ধরে বাগানে ঘুরে বেড়ানোর পর সন্ধের ঠিক আগে পৌঁছেছে পুকুরপাড়ে। আশ্চর্য এক সম্মোহন ক্ষমতা আছে এই পুকুরের। সবুজ শাড়ি পরা মায়ের কোলে যেমন একটি আদুরে শিশু— পুকুরটিকে ঠিক তেমন মনে হয়।

মাত্র কয়েকদিন আগে এইরকম একটা স্নিগ্ধ বিকেলে সে গান গেয়েছিল, ঠিক এইখানে বসে। এক মুগ্ধ যুবক দৃষ্টিকে পায়রা করে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার দিকে। পায়রা আসে, বাকুমবাকুম করে, উড়ে যায়। আবার আসে পায়রা। কিন্তু ভেবে কী হবে? কেকা ওই মুখ ভুলে থাকতে চায়। কোন দুর্বলতা প্রশ্রয় দেওয়ার সামর্থ্য নেই তার।

এবার কোথায় যাবে কেকা? ঘরে ফিরে যাবে। নাদিন গর্দিমার-এর বইটা শেষ করতে হবে। ফারুক কাল তাগাদা দিয়েছে। ঘরে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল কেকা, বাধা পেল।

'কোথায় যাচ্ছেন?'

মেইন গেটের দিক থেকে সিমেন্ট-বাঁধানো আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে আসছে ফারুক। পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। কেকা গত দু'দিন লোকটাকে এড়িয়ে থাকছে। এইরকম মুহূর্তে এই জায়গায়ই দেখা হবে, ভাবেনি। সে উদাস-উদাস চোখ মেলে তার দিকে তাকাল।

'আসেন, ওই চাতালে বসি। বেশ বুঝতে পারি, ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আমার সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারেন না।'

কথাটা কি সত্যি? কেকা ভেবে বার করতে চেষ্টা করে। 'কে বলল?'

চাতালে নয়, ঘাটের শেষ সিঁড়িতে পানি ছুঁয়ে বসল দু'জন। ফারুক গম্ভীর স্বরে বলল, 'আজকাল বিশেষ কথা বলছেন না যে!'

কেকা কলমিলতার ঝোপে পা ডোবায়। পানি নিয়ে খেলা করে। আজ সে একটা জংলি ছাপা প্রিন্টের কামিজ পরেছে। কাপড়ের রঙের সঙ্গে মিলে গেছে দুর্বা আর কাশবনের রঙ।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'হাতির দাঁতের ওই যে মূর্তি···ওটা দেখেই কি আপনার মনে স্বপ্ন জাগে নাকি ওই চেহারার কারুর সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছিল?'

ফারুক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কেকার দৃষ্টি পুকুরের ছোট ছোট ঢেউয়ের ভিতর হারিয়ে গেছে। ফারুক ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারের ভিতর আরও গাঢ় অন্ধকার চুল, তার নিচে একটি স্থির মুখ, মসৃণ গলা আর কাঁধ, ঢেউয়ের মত মন-কেমন-করিয়ে-দেওয়া বুক নিয়ে সে একটি সম্পূর্ণ প্রতিমা হয়ে ওঠে। অথবা, কে জানে, ফারুক হয়তো ঠিক জানে না, একটি অল্প-চেনা রহস্যময় মূর্তি জীবনবতী হয়ে এসে বসেছে তার পাশটিতে।

কেকার মুখের ওপর দ্বিধা থরোথরো তর্জনী রাখে ফারুক। কেকা কি একটু কেঁপে উঠল? নাকি তার নার্ভাস আঙুলই হঠাৎ পিছলে নেমে এল ভরাট গালের পথ বেয়ে, নাকের চড়াই-ওতরাই পার হয়ে শেষ পর্যন্ত চিবুকের ঢালু দেয়ালে। বাধা দিল না কেকা। কিন্তু ফারুক নিজেকে শাসন করল। সে কি একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছে না?

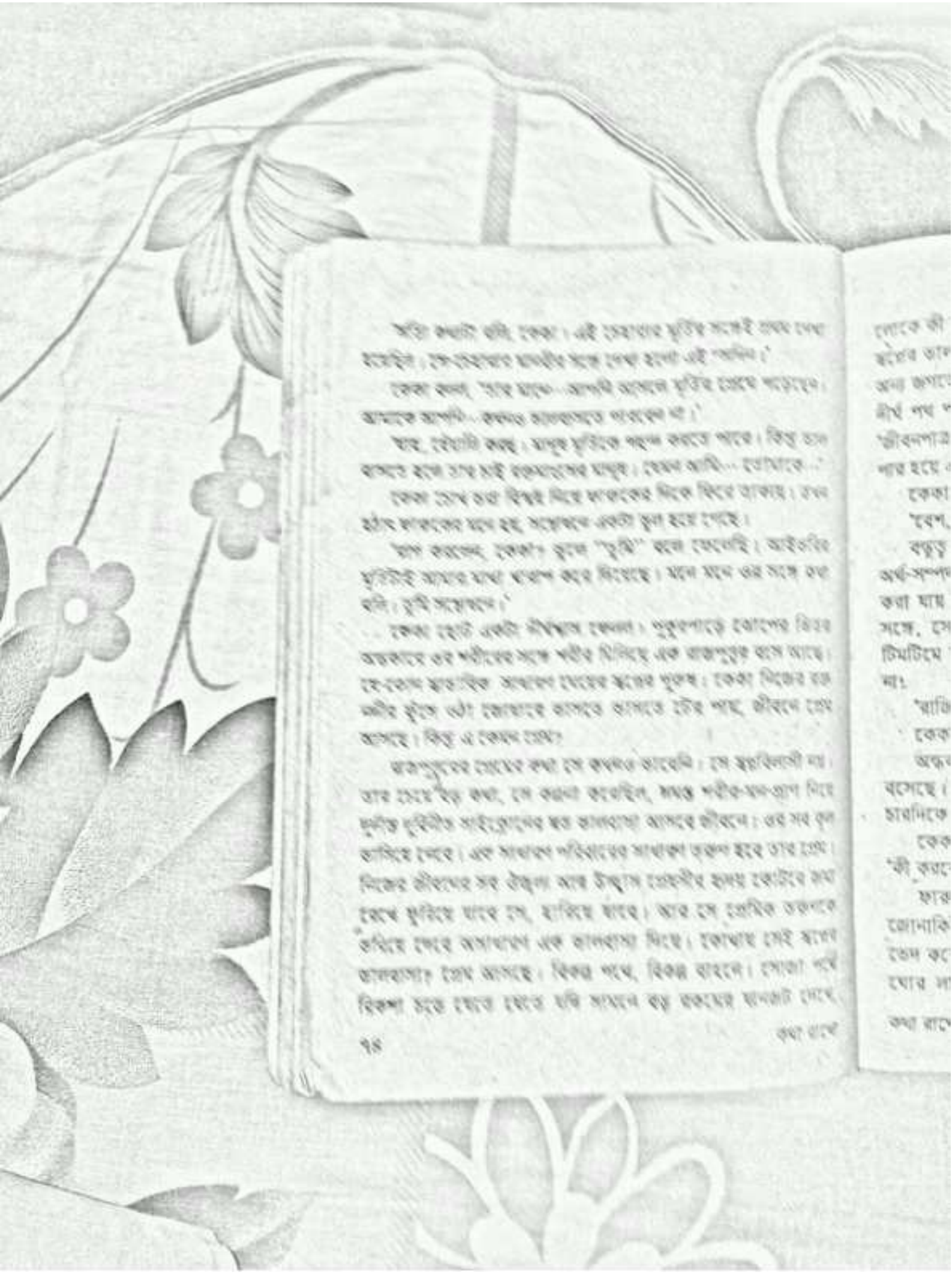

'অতি কথাটি ঠিক, কেকা। এই চেহারায় দুটিই সত্যেই প্রথম দেখা হয়েছিল, সে-চেহারায় আমাদের সঙ্গে দেখা হলো এই পর্যন্ত।'

কেকা বলল, 'তার মানে... আপনি আমাকে দুটির চোখে পড়েছেন। আমাকে আপনি... কখনও ভালোবাসতে পারবেন না।'

'হায়, বৈজ্ঞানিক কল্প। মানুষ দুটিকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তাকে জানতে হলে তার মধ্যে একজনের মানুষ। যেমন আমি... তোমাকে...'

কেকা চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাকনের দিকে ফিরে তাকায়। তখন হঠাৎ কাকনের মনে হয়, অজান্তে একটা ভুল হয়ে গেছে।

'ভুল করলেন, কেকা। ভুলে "তুমি" বলে ফেলেছি। আজকাল দুটিকেই আমার মধ্যে আপন করে নিয়েছে। মনে মনে ওর সঙ্গে কথা বলি। তুমি ক্ষমা করবেন।'

কেকা হেসে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চুপচাপ কোনের ভিতর অন্ধকারে ওর শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে এক রাজপুত্র বসে আছে। যে-কোন কুমারীর আকাঙ্ক্ষিত সেরা পুরুষ। কেকা নিজের মত খুঁজে ওই রাজপুত্রকে কাছে পেতে চেয়েছিল, জীবনে চেয়ে এসেছে। কিন্তু এ কেমন চাওয়া?

রাজপুত্রের চেহারার কথা সে কখনও ভাবেনি। সে স্বপ্নবিলাসী না। তার চেয়ে বড় কথা, সে কল্পনা করেছিল, কখনও শরীর-মন-প্রাণ দিয়ে দুটির দুটিতে সাইক্লোনের মত ভালোবাসা আসবে জীবনে। ওর সব দুঃখ ভাসিয়ে নেবে। এক সাধারণ পরিবারের আকাঙ্ক্ষা তখন হবে তার চোখে। নিজের জীবনের সব ঔজ্জ্বল্য আর উচ্ছ্বাস রোমান্টিক স্বপ্ন রেখে দুটিয়ে যাবে সে, হারিয়ে যাবে। আর সে রোমান্টিক তরুণকে ভরিয়ে দেবে অসাধারণ এক ভালোবাসা দিয়ে। কোথায় সেই স্বপ্নের ভালোবাসা? চোখ জ্বলছে। বিকল্প পথ, বিকল্প ব্যবস্থা। সোজা পথেই বিকশিত হয়ে যেতে হবে যদি আসবে বড় রকমের ঝামেলা দেখে,

লোকে কী করে? রিকশা ছেড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অন্য পথ ধরে। তার স্বপ্নের ভালবাসার সেই দশা। প্রেমের পাত্রটি ঠিক তার কেউ নয়; সে অন্য জগতের, অন্য সমাজের। তার সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই পারছে না কেকা। অথচ তার 'জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' মাধুরী দান করার জন্য ছায়াতরু ছাড়া দীর্ঘ মরুপথ পার হয়ে একজন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেকা বলল, 'রাগ করিনি।'

'বেশ, আমরা বন্ধু। দু'জন দু'জনকে "তুমি" বলব।'

বন্ধুত্ব অন্য ব্যাপার। বন্ধুত্বের পিছনে সমাজ-সংসার-জীবন-যৌবন-অর্থ-সম্পদ, এইসব নেই। কোন শর্ত নেই। বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আবেদার কাজ শেষ হলে সে ঢাকায় ফিরে যাবে তার সঙ্গে, সেখান থেকে চলে যাবে পাবনা। ধনীর দুলাল নিশ্চয় সেই টিমটিমে শহরে তার সঙ্গে প্রেম করার জন্য সবুজ সন্ধ্যা খুঁজতে যাবে না।

'রাজি তো?' তাগাদা দিল ফারুক।

কেকা বলল, 'বেশ।'

অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। পুকুরের পাড়ে জোনাকির মেলা বসেছে। দলছুট একটা জোনাকি ঘুরঘুর করছিল ফারুকের কাঁধের চারদিকে। একটু চেষ্টা করতেই পোকাটা ধরে ফেলল সে।

কেকার হাতের মুঠি ধরল সে অন্য হাতে। হাসি পাচ্ছে কেকার। 'কী করবে?'

ফারুক কেকার হালকা অপ্রশস্ত হাতের তালুতে গুঁজে দেয় জোনাকিটা। কেকা অদ্ভুত এক শিহরণ বোধ করে। তার পাতলা পেশী ভেদ করে ফুটে উঠছে আলোর জ্বলা-নেভা খেলা। ওর নিজের চোখে ঘোর লাগে। ঘোরটা উসকে দেয় তালুর ভিতর পোকাটার দ্রুত

ছটফটানি। যতই আদরে রাখো, বন্দী কখনও সুখী নয়। কিন্তু কেকা বুঝতে পারে, তালুর ভিতরের সেই শিরশিরানি ক্রমেই সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। হাসি পাচ্ছে তার। বিষম আন্দোলন হচ্ছে শরীরে।

'অ্যাই, কী করছ? জলে পড়ে যাবে যে!'

কেকার হাসির বেগ বাড়ল। 'সুড়সুড়ি লাগছে। মুঠি খুলব?'

'দূর! কত কষ্ট করে ধরেছি জোনাকিটা! চুপ করে বসে থাকো। সুড়সুড়ি সেরে যাবে। গান শুনবে?'

বলেই গলা ছেড়ে গান ধরে ফারুক। 'জোনাকি, ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ...'

কেকা ভুলে যায় অস্বস্তিকর সুড়সুড়ির কথা। দ্বিতীয় চরণে সে গলা মেলায় ফারুকের সঙ্গে। 'এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ...'

একটা ব্যাপারে বিষম বিস্ময় জাগে কেকার। ফারুক যে-গানই গেয়ে ওঠে, যে-গানই শুনতে চায় কেকার কাছে, তা-ই বড় প্রিয় গান কেকার। এই ভালবাসাটা নতুন নয়, কেকা জানে। অনেকদিনের পোষ পাখির মত। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার এই যে প্রিয় গানগুলো সব দু'জনের মধ্যে মিলে যাচ্ছে।

স্বরে স্বর মিলিয়ে, সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে কেকা অবশ্য নিজেকে প্রবোধ দেবার একটা ভাষা খুঁজে পায়। গান গানই। জীবন নয়। গানের মিল নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

আভোগে পৌঁছে ফারুক টের পায়, শেষদিকের কথাগুলো ভুলে গেছে সে। কেকা যুগিয়ে দিল। 'তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো...'

পরের লাইন অনায়াসে ধরল ফারুক। 'তুমি ছোট হয়ে নও ছোট...'

শেষ লাইন গাইল আবার দু'জনে একসঙ্গে। 'জগতে যেথায় যত

আলো সবই আপন করে নিয়েছ, ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ...'

গান শেষ হয়, হাতের তালু থেকে পালিয়ে যায় জোনাকি, তবু কেকার মনে বাজতে থাকে গানের কলি, যা দৃশ্যত অর্থপূর্ণভাবেই গেয়েছে ফারুক। তার একটা হাত কেকার কাঁধে। কেকা নিজের হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে অন্ধকারে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। জোনাকি ঝিকমিক করছে কলমি ঝোপের ওপর।

'একটা প্রশ্ন করব। সত্যি উত্তরটা চাই।'

'কেকা বলল, 'বেশ, পাবে।'

'তোমার জন্যে কি কেউ অপেক্ষা করে আছে? অথবা তুমি কি কাউকে ভালবেসেছ?'

অনেকটা সময় নিয়ে উত্তর দিল কেকা। 'না।'

'তা হলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ কেন?'

'বারবার একই কথা শুনতে চেয়ো না।'

ফারুক বলল, 'তোমার ব্যাখ্যাটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। মনে হচ্ছে অন্য কোন কারণ আছে আমাকে ফিরিয়ে দেবার। একাধিক কারণও থাকতে পারে।'

ছন্দা ভাবীর ঘরটার কথা কেকার মনে হয়ে যায়। মরহুম কাজী সালামের যত বড় ছবি দেয়ালে ঝুলছে, ঠিক তত বড় ছবি কাজী ফারুকের—ঝুলছে বিপরীত দেয়ালে। এটা কি ছন্দা ভাবীর মনের দেয়ালেরই বাস্তব রূপ? কিন্তু কেকা এও বোঝে, সব প্রশ্ন করা যায় না, করতে নেই। প্রশ্ন না করেও মানুষ জীবনের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায়। তা ছাড়া সব প্রশ্নের উত্তর না পেলেও কিছু ক্ষতি নেই। বরং অনেক প্রশ্নের উচ্চারণই স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে। কী দরকার?

কেকা বলল, 'আমাদের দুটো জীবন আলাদা। দুটো দুই জগতের।

আমাদের মিলন হতে পারে না। তা···মিলনের সম্ভাবনাই যেখানে নেই, সেখানে ব্যাখ্যার কী আছে?'

ফারুক দূর আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'বিয়ে তো একটা করবে, তাই না?'

কেকা স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বলল, 'করতে যখন হবেই, করব।'

'কেমন বিয়ে? নিজের পছন্দ অনুসারে, নাকি বাবা-মা যেমন ঠিক করে দেন?'

'সেটা কি এখনই বলা যায়?'

'নিশ্চয় যায়। ধরো আজ রাতেই খবর পেলে, তোমার বাড়িতে···'

বাধা দিয়ে কেকা বলল, 'বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তখন কী করব, তাই তো?'

'ধরো, তা-ই।'

কেকা বলল, 'পাত্র যদি আপনি কিংবা আপনার মত কেউ হয়, জানিয়ে দেব, বিয়েতে আমার মত নেই। আর যদি বুঝি সে আমার গোত্রের কেউ, তা হলে ভেবে দেখার জন্যে সময় নেব।'

'বুঝেছি। এতদিন আইভরির যে মূর্তির ধ্যান করেছি, সে পাষাণ নয়, পাষাণ তার সদৃশা এই রক্ত-মাংসের মানবী।'

'গাল দিচ্ছ?'

'তোমাকে গাল দিয়ে যদি সরে যেতে পারতাম—'

কেকা ধীরে ধীরে সঙ্কোচ কাটিয়ে তার হাত রাখল ফারুকের কাঁধে। 'আমি সত্যি সাধারণ একটি মেয়ে। অতি সাধারণ। তুমি আমার দারিদ্র্যের খবর রাখো না। তোমার প্রিয় অ্যান্টিকস্-এর সঙ্গে চেহারার মিল দেখে অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু যখন দেখবে, দুটো আলাদা শ্রেণীর আলাদা মেজাজের জীবন আর যেভাবেই মিলুক, ভালবাসার স্রোতে মিশতে পারে না, তখন তোমার মোহভঙ্গ হবে।'

তীব্র শ্লেষের সুরে ফারুক বলল, 'চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করতে জানো দেখছি। গুরু কে তোমার? মহাজাতক?'

কেকা কিছু বলল না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। ভালবাসা নিয়ে যদি অমন স্বপ্ন না দেখত সে, ভালই হত। ফারুকের প্রস্তাব লুফে নিতে পারত। না-ই বা হলো ভালবাসা, এমন নিটোল সুন্দর একটি বাসা তো হত! এই বাগান আর পুকুরটাও ভারি সুন্দর। পাড়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ফারুক বলল, 'ঘরে আসবে না, বুঝলাম। কিন্তু মনের প্রাঙ্গণে পা ফেলতে দ্বিধা নেই তো?'

অন্ধকারের ঘোরে কেকা বলে ফেলল, 'না।'

এগারো

ফারুকের জীবন হঠাৎ দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে। খাওয়াদাওয়া, ব্যবসা, ভ্রমণ, ক্লাবের খেলাধুলা—কিছুই ভাল লাগে না। যে গান একসময় প্রাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে হত, তাও পানসে লাগে। আজকাল সে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসে সবার শেষে। একা খাওয়ার সুবিধে আছে, কারুর অনুরোধে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু খেতে হয় না।

সেদিন সে রাতের খাওয়া শেষ করেছে স্রেফ ছোট স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ডের আকারের এক টুকরো রুটি আর সবজি ভাজি দিয়ে। নাজমা এনে দিয়েছে সে-রাতের বিশেষ আকর্ষণ— ইলিশের দোপেঁয়াজা আর

নতুন সিমের সঙ্গে বড় মাগুর মাছের ভুনা। ফারুক সেসব ছুঁয়েও দেখেনি। নাজমার ইঙ্গিত পেয়ে ছুটে এসেছেন ছন্দা। ফ্রিজ থেকে বার করেছেন দুধের পায়েস আর পুডিং।

কী হয়েছে, ভাই লক্ষ্মণ, কিছুই নাকি খাচ্ছ না!'

'কে বলল? এই তো, প্রচুর খেলাম।'

'এই খাবারগুলো একটু চেখে দেখো তো, ভাল লাগবে।'

ফারুক উঠে পড়েছে। 'না, ভাবী। ওগুলো পাপুলের খুব প্রিয়। ওকে দিয়েছ?'

'পাপলুর গা গরম। খেতে পারছে না। দুধ আর পাউরুটি খেয়েছে। কাল একবার রবিউল ডাক্তারের ওখানে যাব।'

ছন্দা এগিয়ে আসেন। 'ফারুকের কপালে হাত রেখে পরীক্ষা করেন। 'তোমার শরীর ভাল তো?'

'হ্যাঁ, ভাবী, ঠিক আছে। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তুমি তোমার অতিথিদের দিকে নজর দাও।'

ছন্দা চুপটি করে হাসেন। জানেন, ওটা ফারুকের অভিমান। মুশকিল হচ্ছে এই অভিমান কার ওপর—ঠিক বুঝতে পারছেন না। ফারুকের পিছন পিছন তিনি গিয়ে ঢোকেন তার কামরায়। লাইট জ্বলছে, ফ্যান ঘুরছে, রেকর্ড প্লেয়ারটাও চালু আছে। দীর্ঘ বাদন শেষ হবার পর ডিস্কে স্থির হয়ে আছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছন্দা রেকর্ড বদলে দেন।

নতুন গান নতুন আমেজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। 'গভীর রাতে হঠাৎ জেগে তোমায় মনে পড়ল...'

'ভাই লক্ষ্মণ, একটা কথা ছিল।'

ফারুক চেয়ারটা এগিয়ে দেয় ছন্দার দিকে। একটু দূর থেকে শিশুর কোলাহল ভেসে আসে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বোঝা

মারামারি হচ্ছে বিছানায় মায়ের পাশের জায়গা দখল করা নিয়ে।

ফারুক বিছানায় বসে বলল, 'পাপলু নিশ্চয় টুসিকে আচ্ছামতন পিটাচ্ছে!'

ছন্দা এক মুহূর্তের জন্য কোথায় যেন হারিয়ে যায়। 'দিন দিন দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। আজকাল আমার কথা একটুও শোনে না। কী যে করি ওকে নিয়ে! তোমাকে যে বলব, ভরসা পাই না। এত ব্যস্ত থাকো!'

অনেকক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। কান্না, মারামারি, দৌড়ঝাঁপ—সব শব্দই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। শোকেসের ভিতরে দৃষ্টি বোলান ছন্দা। এক কোণে এস্কিমোদের ঘরের আদলে বানানো টাইম পিসটা চোখে পড়ে। রাত এগারোটা। ভাল কথা, টাইম পিস আগে ওখানে ছিল না। কে সরাল? ঘরের আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেসব জিনিসে হাত দেবার অধিকার ছন্দারও নেই, সেসব জিনিসের জায়গা বদলাবদলি দেখে তিনি অবাক হন।

ঘটনাটা বুঝে উঠতে তিনি অবশ্য বেশি সময় নেন না। তাঁর মুখের রণাঙ্গনে পিছু হটে যায় বেদনার দুর্বল সৈন্যেরা। বিজয়ী বাহিনীর উৎফুল্ল, পরিতৃপ্ত সৈন্যদল এসে জায়গা দখল করে সারে সারে। কিন্তু ফারুকের মুখ যেন ক্রমেই কালো হয়ে উঠছে।

'কী গো, ভাই? তোমার ঘরখানা যে আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তোমার মুখে অমন আঁধার কেন?'

ফারুক কাঁপা কাঁপা শব্দে হাসল। 'আলো আর কোথায় পেলাম? আলোর একটুখানি আভাস পেয়েছিলাম শুধু। তারপর দেখি সব মেঘে ঢেকে গেছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন ছন্দা। ফারুকের হাসিটা তাঁর বুকে বেদনার মত বাজছে। তিনি তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। কেন চারপাশের সবার কষ্ট ঠিক তাঁর

নিজের বুকের ভিতর বাজে? কেন অন্যের সমস্যার কথা শুনলেই তাঁর মনে হয়, সমস্যাটা তাঁরই? এমনিতে তিনি কিছু উদারস্বভাবা নন। অকৃপণ হাতে কাউকে কিছু দিতে চান না তিনি। তবু কেন ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় অন্যের দুঃখ ভুলিয়ে দিতে, কষ্ট মুছিয়ে দিতে?

যখন বেঁচে ছিলেন, সালাম খান স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়েছেন। এতে অনেক সময় সমস্যা বেড়ে যায়। অন্যের ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়ানো ভাল, কিন্তু অন্যের যন্ত্রণা নিজের বুকে টেনে স্বয়ং নীলকণ্ঠ হওয়া কোন কাজের কথা নয়। এই যে কাছের ব্যথিত মানুষটি— দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আশা করছে তাঁর কাছ থেকে—তিনি কীভাবে এড়াবেন? জটিলতা দেখা দেবার সম্ভাবনা একেবারে নেই, তা নয়। আড়ালে নাজমা এমনকি করিম খানের কনস্ট্রাকশন কাজের ম্যানেজার তাপস চক্রবর্তীর যে-ভাই এখানকার ট্র্যান্সপোর্ট সিণ্ডিকেটে চাকরি করে আর অবসরে মাঝে মাঝে এসে এ-বাড়ির ফাইফরমাশের বেগার দেয়, সেই পরিমল চক্রবর্তীও কয়েকবার কথা উঠিয়েছে বিধবার সঙ্গে অবিবাহিত দেবরের মাখামাখি নিয়ে।

আজ, মানে যে-সময়টায় এ বাড়ির ইতিহাসে যুগসন্ধি এসে উপস্থিত হয়েছে তখন যতটা পারা যায় সাবধানতার সঙ্গে চলাই ভাল। বলা কি আর যায়? কখন কোন দৃশ্য দেখে আবেদা মুখ সিঁটকায়, এমনকি ওই যে রহস্যময়ী রূপবতী আইভরিওয়ালী— রূপের দেমাগে যার পা মাটিতে পড়ে না— সেও বা কোন মুহূর্তে হঠাৎ 'এ ছি' বলে ওঠে, ছন্দা কি জানেন?

'সব আমাকে খুলে বলো, ভাই।'

ফারুক বলল, 'বোঁচকা নেই, ঠোঙাও নেই, ভাবী। খুলবটা কী?'

স্নেহময়ী একহাতে ফারুকের মাথায় হাত রাখেন, অন্য হাতে ধরেন তার হাত। 'আল্লার কিরে, লক্ষ্মণ, আমার কাছে লুকিয়ো না। আখেরে

ভাল হবে। কথা হয়েছে সুন্দরীর সঙ্গে?'

সিগারেটের শেষাংশটার মত দ্বিধা ছুঁড়ে ফেলল ফারুক। 'হ্যাঁ।'

ছন্দা নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছেন। 'তারপর?'

'তারপর আর কী? সোজা "না" বলে দিল।'

'"না" বলে দিলেই অমনি হলো! ইস! ভারি এক সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এসেছেন, ওনার জন্যে বুঝি সম্রাট জাহাঙ্গীর চাই?'

ফারুক হাসে। 'না, ভাবী। ঠিক তার উলটো। সে হয়তো কোন ভিখিরি যুবক পেলেই খুশি। বড়লোককে ভয় পায় সে।'

সজোরে নিজের মুখ ঝাঁকানি দেন ছন্দা। 'হুঁহ, আর বলতে হবে না। ওসব হচ্ছে ঢঙ। আসল কথা...'

ফারুক তাঁকে কথা শেষ করতে দেয় না। 'থাক এ-কথা।'

মুখ ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন ছন্দা। লং প্লেয়িং রেকর্ডের একটি পিঠের গানগুলি আপনমনে বেজে থেমে গেছে আকাই মিউজিক সেন্টার। রেকর্ডটা উলটে দেবার ইচ্ছে মরে গেছে।

বেড সাইড শেল্‌ফ্‌ থেকে লিও টলস্টয়ের 'দ্য ক্রুয়েৎজার সোনাটা' তুলে নিয়ে উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে বসে ফারুক। 'অনেক রাত হলো, ভাবী। এবার ঘরে যাও। ছেলেমেয়েরা ভয় পাবে হয়তো।'

ছন্দা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা।'

বই সরিয়ে রেখে ফারুক বলল, 'বলো।'

বলা হলো না। টেলিফোনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। ছন্দা ক্ষিপ্র বেগে উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে, কাল সকালে কথা হবে। আমাকে না বলে চলে যেয়ো না যেন।'

'আচ্ছা, যাব না।'

টেলিফোনে আইরিনের গলা। 'কেমন আছ, ভাবী?'

ছন্দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ভাল না। তোমরা?'

'আমাদের কথা বাদ দাও। আমাদের রাজপুত্তুরের খবর কী?'

'রাজপুত্তুরকে নিয়েই তো যত চিন্তা। এত খোঁজাখুঁজির পর যদিও ব রাজকন্যে নিজে এসে ধরা দিল, সে এখন···কি আর বলব···সব ভণ্ডু করে দেবার পথে।'

আইরিনের স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে। 'তুমি থাকতেও সব ভণ্ডু হবার পথে? বিশ্বাস করতে পারছি না। নাও, তোমার ননদাইয়ের সঙ্গে কথা বলো।'

করিম খানও প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। 'না, ভাবী আপনাদের যত বারফট্টাই, সব মুখে। রাজপুত্র, পুরো রাজত্ব, রাজকন্যা, রোম্যান্টিক প্রাসাদ, আধা-বন্য আধা শহুরে বাগান, নিরিবিলি মুহূর্ত-সব আছে, সর্বোপরি আছে আপনার মত···কি যে বলে সংস্কৃতে··· পৌর্ণমাসী প্রজাবতী। তার পরও কিছু হচ্ছে না?'

রাগ করা দরকার। নইলে মুখে যা আসবে তা-ই বলতে থাকবে করিম খান। কিন্তু রাগ করার আগে শব্দ দুটোর মানে জানা দরকার।

ছন্দা ঢোক গিলে বললেন, 'পৌর্ণমাসী প্রজাবতী মানে!'

'তা-ও জানেন না! কি যে মুশকিল আপনাদের নিয়ে! পৌর্ণমাসী মানে কৃষ্ণলীলার মধ্যস্থতাকারিণী···যোগমায়া আর কি···বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। আর প্রজাবতী মানে ভাইয়ের বউ।'

নাহ, এর পর আর রাগ করা যায় না। এমন সুন্দর দুটো নাম বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানালেন ছন্দা। 'ভাল জিনিস ছেড়েছেন। মনে রাখব।'

'কিন্তু আমাদের আসল যোগ অঙ্কের কী হবে? ফলাফল শূন্য?'

'আমি কী করব, বলেন? দেমাগি মেয়েটা আমাদের রাজপুত্তুরের মুখের ওপর "না" বলে দিয়েছে। ফারুকের মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না গো। খাওয়াদাওয়া তো ছেড়েছে কবেই! কাজকর্মে মন নেই

ব্যবসা লাটে উঠবে।'

টেলিফোনের তার বেয়ে করিম খানের ধমক ছুটে এসে ছন্দার মস্তিষ্কে পৌছে যায়। 'ব্যবসা জাহান্নামে যাক, ভাবী। আপনি বুঝতে পারছেন না, বংশ শেষ হতে চলেছে। আপনি বোধহয় জানেন না, ওদের বংশের প্রায় সব পুরুষই ত্রিশ বছরে পৌছে হয় গৌতম বুদ্ধের মত সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছাড়ে, না হয় আত্মহত্যা করে। আইরিনের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?'

এর পর গলার স্বর নামিয়ে করিম খান সাহেব বললেন, 'আইরিন, তুমি একটু ওদিকে যাও তো, আমরা পরের ছেলেমেয়ে তোমাদের গুষ্টি নিয়ে একটু ষড়যন্ত্র করি।...হ্যাঁ, ভাবী, যা বলছিলাম। আমরা কোন কথা শুনতে চাই না। বিয়েটা লাগিয়ে দিতে হবে।'

'জোর করতে বলছেন, ভাই?'

'জোর? মানে বল-এর কথা বলছেন তো? আগে ছল, তারপর কৌশল, সবার শেষে উঠবে বল-এর প্রশ্ন।'

ছন্দার গলার স্বর অসহায়ের মত শোনায়। 'মেয়ের একেবারেই মত নেই।'

করিম খান প্রায় গর্জে ওঠেন। 'কিন্তু ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। বাবা-মা এক পায়ে খাড়া। অন্যরাও তেমন...'

'কিন্তু ফারুক নিজেই হাল ছেড়ে দিয়েছে।'

করিম খান কয়েক সেকেণ্ড নীরব রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুঁ। তার মানে সেকেণ্ড ফেজ-এ চলে আসতে হচ্ছে।'

'মানে!'

'মানে কৌশল।'

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ রিসিভার লাগিয়ে রাখতে হচ্ছে কানের

সঙ্গে। ছন্দা ক্লান্ত। ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান আর মাথা। কিন্তু রিসিভার নড়ানোর কথা ভাবতে পারছেন না মহিলা। তাঁর ননদাই দাওয়াই বাতলাচ্ছেন। কৌশল পর্বের দাওয়াই। তিনি সুনিশ্চিত, এতে কাজ হবে। তৃতীয় পর্বে হাত দেবার দরকার হবে না।

করিম খান-এর কথার মধ্যে দু'বার ঢুকে পড়তে চেষ্টা করেছেন ছন্দা, পারেননি। তিনি আগে তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে বলবেন, তারপর অন্য কথা শুনবেন।

তাঁর কথা শেষ হবার পর ছন্দা বললেন, 'এটা এক ধরনের নিষ্ঠুরতা হয়ে যাচ্ছে না?'

করিম সাহেব বোমার মত ফেটে পড়লেন। 'হোয়াট!'

ছন্দা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি।'

'হা-হা-হা...দ্যাটস্ আ গুড গার্ল।'

বারো

মহা সমস্যায় হাবুডুবু অবস্থা আবেদার। তার ধারণা ছিল, প্রয়োজনীয় তথ্যের সবই পাওয়া যাবে ফারুকের লাইব্রেরিতে। ব্রিটিশ আমলের অনেক তথ্য পাওয়া গেল, কিন্তু পাওয়া গেল না সুলতানী আমলের কোন খবর।

ফারুক যেসব ঐতিহাসিক জায়গা চিনত, সবখানেই নিয়ে গেল ওদের। কিন্তু ঘোরাঘুরিই সার। ঐতিহাসিকদের কারুর অমত নেই যে

যশোরের পুরানো নাম মুরলি কসবা। কিন্তু ঠিক কোন জায়গাটা সেই প্রাচীন যশোর, তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই।

হৈবতপুরের একটা ধ্বংসাবশেষ কিছুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গিয়েছিল। লোকে জানত, ছোটখাট পাহাড়ের মত ওই টিবি আসলে পুরানো কোন ব্রিকফিল্ডের কিলন্। ড. কামার ফরিদের বইয়ে সামান্য একটু আভাস ছিল। কিন্তু কেউই আর বিশেষ আগ্রহ দেখাননি হৈবতপুরের ধ্বংসাশেষ নিয়ে।

যশোরের সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র অনন্ত গাঙ্গুলি এসেছিল ব্যক্তিগত কাজে। ঠিক তার নিজের কাজে না, বাবার ফার্মের কাজ সারতে তাকে পাঠানো হয়েছিল।

ড্রইং রুমে বসতে দেওয়ার পরিবর্তে নাজমা তাকে নিয়ে গিয়েছে লাইব্রেরিতে। কতটা এলোমেলো, বিস্রস্ত কাপড়ে এক মহিলা মন দিয়ে বই-পত্র ঘাঁটছে দেখে সে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প না করে তাকে যেতে দেবে কেন আবেদা?

কাজের খানিকটা বিঘ্ন হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মস্ত উপকার হয়ে গেল আবেদার। অনন্ত এক প্রাচীন পুঁথির রেফারেন্স টেনে বলল, হৈবতপুরের ধ্বংসাবশেষ আসলে এক বিখ্যাত, প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারাম।

তরতরিয়ে এগিয়ে গেল আবেদার গবেষণার কাজ। বাকি রইল কেবল ওই জায়গায় সরেজমিনে একবার পরিদর্শন আর সব মিলিয়ে নতুন রাইট আপ। মন ভাল ছিল না ফারুকের। তবু সে সম্মত হলো। অনন্ত প্রধান গাইড। ফারুকের ব্যক্তিগত আগ্রহের অভাব নেই। আবেদা গেছে নিজের দায় মেটাতে। কেকা তো সঙ্গে যাবেই। এভাবে চারজনের দল কলবল করতে করতে হৈবতপুরে পৌছল।

কেকা প্রথমে গোলমালটা ধরে উঠতে পারেনি। 'কী আশ্চর্য! ঠিক এইরকম একটা ধ্বংসাবশেষ দেখতে কয়েকদিন আগে অন্য এক জায়গায়

গিয়েছিলাম। হুবহু একই রকম দেখতে...'

আবেদা হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি। অনন্ত হতভম্ব। কেকা খুবই বিব্রত। কিন্তু নির্বিকার দৃষ্টিতে মাটি আর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে আছে একা ফারুক। যেন কোন কথাই তার কানে ঢুকছে না।

অন্য কোন উপায় না দেখে কেকা শেষ পর্যন্ত ফারুকের শরণাপন্ন হয়। 'আমি কি কোন ভুল করেছি, ফারুক সাহেব?'

ফারুক একটু ভাবল। 'একটা না, দুটো ভুল করেছ।'

'বুঝলাম না।'

'ছেলেবেলায় "আ স্কলার অভ্ কোসাই" নামে একটা গল্প পড়েছিলাম। এক আত্মভোলা পণ্ডিত তাঁর গ্রাম থেকে অনেক দূরের কোন গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে পাহাড়ের গুহার ভিতর আশ্রয় নেবেন, তার আগে গুহার বাইরে লাঠিটা রাখলেন এমনভাবে যেন সেটা গন্তব্যের দিক নির্দেশ করে। তারপর তো পণ্ডিত গুহায় ঢুকে কষে দিলেন ঘুম।'

'তারপর?'

'ভোরবেলা এক পথিক ওই পথে যাবার সময় লাঠিটা হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু যেই দেখলেন, গুহার ভিতর একজন ঘুমিয়ে আছেন, অমনি রেখে দিলেন লাঠিটা। কিন্তু তিনি তো আর দিক-নির্দেশনার ব্যাপার-স্যাপার কিছু জানেন না। উলটো দিক, মানে যেদিক থেকে পণ্ডিত আসছিলেন, সেই দিক নির্দেশ করে লাঠি পড়ে রইল গুহার সামনে।'

আবেদা আর অনন্ত এসে দাঁড়িয়েছে গল্পের কাছে। 'তারপর? তারপর?'

'তারপর আর কী? পণ্ডিত ভোরবেলা লাঠি তুলে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে চললেন নিজের গ্রামের দিকেই। কিন্তু তিনি তো জানেন, অন্য এক গ্রামেই যাচ্ছেন। যতই যান, ততই চোখে পড়ে চেনা

দৃশ্য। পণ্ডিত ভাবেন, পৃথিবীর সব গ্রামই এক, সব পথ একই রকম দেখতে। ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। তখনও রহস্য ধরতে পারেননি। নিজের বাড়ি পৌঁছে ভাবলেন, ছেলেমেয়েগুলো তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের মতই। এমনকি স্ত্রীটিও। যখন বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বললেন, "ভদ্রে", যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে দেখতে ঠিক...'

এরপর আর গল্প চলল না। হাসির তোড়ে হারিয়ে গেল গল্প। সঙ্কোচে কাহিল অবস্থা কেকার। 'তার মানে সেদিন...এখানেই...'

আবার হাসি।

আবেদার উচ্ছ্বাস সবচেয়ে বেশি। হঠাৎ বিরক্তি লাগল ফারুকের। ওকে বেকায়দায় ফেলে ওই মহিলা এত খুশি কেন? ওই মহিলাকেও একটু খোঁচা দেওয়া দরকার। ফারুক সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

অনন্ত একটা কালো পাথরের ঢিবির দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আবেদা আপা, পাথরটার বয়স কত?'

গবেষক উত্তর দিল, 'তিন হাজার বছর।'

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল ফারুক, 'উঁহুঁ, তিন হাজার বছর তেরো দিন।'

আবেদা ঘাবড়ে গেছে। অনন্ত গাঙ্গুলির চোখে অনন্ত প্রশ্নের ভিড়। কেকা টানটান স্নায়ু নিয়ে অপেক্ষায় আছে।

'এত নিশ্চিত, নিখুঁত বয়স বললেন কীভাবে?'

ফারুক বলল, 'তেরোদিন আগে আপনি বলেছিলেন, পাথরটার বয়স তিন হাজার বছর। সোজা হিসেব আর কি।'

হাসাহাসি জিনিসটা হাসির চেয়ে অনেক বেশি ছোঁয়াচে আর পুনঃপৌণিক। থেমে থেমে হররা চলল বাসায় ফিরে আসার পথে, এমনকি বাসায় পৌঁছনোর পরও। আরও কতক্ষণ চলত বলা মুশকিল যদি না হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ ওদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিত।

দুঃসংবাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ছন্দা। সাধারণত এভাবে তিনি ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না। মাথার চুল উস্কখুস্ক। শরীরকে কোনরকমে সান্ত্বনা দিয়ে শাড়ির আসল অংশ ছুটেছে ধুলোর সন্ধানে। পায়ের নিচে স্যাণ্ডেল নেই। খুব নার্ভাস অবস্থায় মানুষ যখন সরাসরি মাটির আশ্রয় খোঁজে তখন নাকি পায়ে জুতো-স্যাণ্ডেল রাখতে পারে না। আর তার চোখজোড়া! সেদিকে তাকাতেও ভয় করে। সেখানে আতঙ্ক, দ্বেষ, ঘৃণা ঠাসাঠাসি করে জট পাকিয়েছে। একটা থেকে অন্যটাকে আলাদা করার উপায় নেই।

'কী হয়েছে, ভাবী?'

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্থির রেখে জানতে চাইল ফারুক। সিঁড়ির ওপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে আবেদা, কেকা। অনন্ত গাঙ্গুলি পথ থেকেই বিদায় নিয়েছিল। আবেদা লোভ দেখিয়েছে, তাকে খাসির ব্রেনের অনবদ্য প্রিপারেশন খাওয়াবে। তাদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা মিস করা বোকামি হবে তার।

কিন্তু অনন্ত আড়চোখে তাকিয়ে ফারুকের মনোভাব বুঝে নিয়েছে। একবারও ফারুক ওই প্রস্তাবে সায় দিয়ে বলেনি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো, দ্বিধা করছ কেন, অনন্ত?'

অনন্ত অন্তত এটুকু বোঝে যে একজন নিমন্ত্রিত অতিথি বরয়িতার প্রস্তাবের আগে অন্যকে সেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। সেটা শোভন নয়। কেকা আবেদার বাহুতে চিমটি কাটতে বাধ্য হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আবেদা চিমটির মর্মবস্তু বোঝেনি, নাকি ইচ্ছে করেই কেকার হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে, কে জানে? কেকা বিব্রত হয়েছে, কিন্তু তখনও দুই টানটান হাসির ঘটনা আবহাওয়াকে তরল করে রেখেছিল। তুচ্ছ বৈষয়িকতা আর আচার-আনুষ্ঠানিকতার ভার জমে

ওঠেনি।

ছন্দা কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর ঠোঁটদুটো শুধু কেঁপে উঠল।

'ভাবী, প্লীজ, কথা বলো।'

'ভাই, চলো, আগে কিছু খেয়ে নাও। আড়াইটে বাজে।'

কেকা এগিয়ে গিয়ে ছন্দার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য পাশে গিয়ে তাঁর হাত ধরতে চেষ্টা করল আবেদা। ছন্দা তাদের দিকে ফিরে তাকালেন না।

ফারুক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পরিমল। মুখ শুকনো, যেন ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। ঘটনা সামান্য নয়— তার আরও লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

ফারুক অবশ্য আর কিছু বলল না। আবেদা মৃদু স্বরে দু'একবার প্রশ্ন করার পর উত্তর পাবার আশা ছেড়ে দিল। তার শাড়ির নিচের অংশ ভরে আছে চোরাকাঁটায়। সেগুলো ছাড়াতে শুরু করল মন দিয়ে।

কেকা ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল নিজের কামরায়। নাজমা এসে নিচু স্বরে বলল, 'আপা, খবর শুনেছেন? ফারুক ভাইয়ের সেই মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে না।'

একটা পালস্ বিট মিস করল কেকা। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'সেই আইভরির মূর্তি?'

'হ্যাঁ গো।'

'কীভাবে হারাল? চোর এসেছিল নাকি?'

নাজমা কথা বলল না। ঠোঁট ওল্টাল।

দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। ভয়ে ভয়ে বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ায় কেকা। সবাই সেখানে জমায়েত হয়েছে। ফারুকের মুখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। রাগে না ঘৃণায়, বোঝা যাচ্ছে না।

মূর্তিটা এত দামী, আগে বুঝতে পারেনি কেকা। ফারুক যখন

অতি যত্নে আগলে রেখেছে। জিনিসটার ওপর কারুর চোখ পড়েছে, তাও কখনও মনে হয়নি। খাওয়ার পর্ব শেষ হলো অতি সংক্ষেপে।

এরপর চলল সন্ধানপর্ব। প্রথমে সব ঘরগুলো খোঁজা হলো। তারপর স্টোর্ রুম, রান্নাঘর, কাজের লোকেদের ঘরগুলো। তৃতীয় পর্যায়ে আউট হাউজ, ছাদ, সিঁড়ির নিচের ঘর— যেটা বাড়তি স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আশেপাশের জঙ্গল, বাগান, এমনকি পুকুরের আনাচ-কানাচও বাদ দেওয়া হলো না। মূর্তির কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

ফারুক ফিরে এল নিজের কামরায়। আবার ভাল করে খুঁজল। অন্য সবকিছু যথাস্থানে আছে। কিছুই হারায়নি। মূর্তির ঢাকনা অসহায়ের মত মুখ গুঁজে আছে শোকেসের ওপর।

নিজের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করে কেকা। ওই মূর্তির মুখ তারই মুখের মত। শুধু এই মিলটুকুর জন্য ধনীর ঘরের দুলালটি তাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে আছে। নিজের মনেও যথেষ্ট আলোড়ন বোধ করছিল কেকা। হঠাৎ তার মনে হলো, সে নিজেই হারিয়ে গেছে।

রাজশাহী থেকে ঢাকা যাবার সময় একটা প্রাইভেট কার পাল্লা দিয়ে ছুটছিল ওদের লাক্সারি কোচের সঙ্গে। গাড়ির পেছনের কাচে স্টিকারে লেখা ছিল: ডোন্ট ফলো মি, আই অ্যাম লস্ট। কেকার একবার মনে হচ্ছে, সে ওই গাড়ির মতই হারিয়ে গেছে। আরও একটা কথা ওর মনে কাঁটার মত বিধছিল। ফারুকের ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার শুধু দু'জনের। এতদিন ছন্দা একাই ওই অধিকার ভোগ করে আসছিলেন। তালিকায় নতুন নাম কেকা। মনে হচ্ছে ও নিজেই সরিয়েছে মহামূল্য আইভরি মূর্তি। মানুষ নিজেকে কেন এমন অকারণ অপরাধী ভাবে? অপরাধবোধ কি তার জন্মগত? কেকা এই প্রশ্নের উত্তর পায় না।

ফারুক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ব্যথিত, ক্লান্ত নিঃশ্বাস। 'বাজারে অনেক

দাম উঠেছিল ঐতিহাসিক মূর্তিটার। ঢাকা থেকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছিলেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ড. এনামুল হক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লোক পাঠিয়েছে। যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজের প্রিন্সিপাল ড. মুস্তাফিজুর রহমান নিজে অনুরোধ করেছেন মূর্তি হস্তান্তরের জন্য। কারুর কথায় কান দেয়নি ফারুক। কয়েকজন বিদেশী অ্যান্টিকস সংগ্রহকারী ভাল দাম অফার করেছে। ফারুকের এক কথা: মূর্তি বেচব না।

এই তো, সেদিনের কথা। ছন্দা হাসতে হাসতে বলছিলেন, 'আসল লক্ষ্মীই তো পেয়েছ! এখন প্রতিমার মায়া ছাড়া যায় না?'

ফারুক হেসেছে। 'রাম কহো। রাম কহো। অমন কথা মুখে এনো না। খোদ লক্ষ্মীকে একটা গান শুনিয়ে খুশি করা যায়। কিন্তু প্রতিমার জন্যে চাই দামী নৈবিদ্যি।'

কোন ফাঁকে পরিমল চলে গেছে আর খবর দিয়েছে প্রেস ক্লাবে, কেউ জানে না। রাত ন'টার মধ্যে বাড়ি ভরে গেল পুলিশের লোকজনে। সাংবাদিকদের প্রায় সবাই এসে ভিড় জমাল। সংবাদ-এর রুকুনউদ্দৌলা ফারুকের সঙ্গে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'মূর্তি খুঁজে বার করার জন্য যা যা করার দরকার, করেন। আমরা আপনার পিছনে আছি।'

মূর্তি, মূর্তি পাচারের সংস্কৃতি আর অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে যত কথা খরচ হলো, তার চেয়ে বেশি অপব্যয় হলো চা আর সিগারেটের। পুলিশ ওঁদের কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেও সাংবাদিকরা আড্ডা দিতে লাগল জমিয়ে। সে আড্ডা ভাঙল প্রায় মাঝরাতে।

আবার নির্জন হয়ে এল বাগানবাড়ি। কেকার ঘুম আসে না। কোথায় যেন কেঁদে উঠল পথের কুকুর। কেকা বুঝল, তারও কান্না পাচ্ছে। বড় হাসি দিয়ে দিনটার শুরু হয়েছিল।

কেকা দুঃস্বপ্ন দেখছিল। অজানা-অচেনা সমুদ্রের ওপর দিয়ে পাখির ডানায় চড়ে উড়ছে সে। একটি ডানায় ভর করে আছে সে; অন্য ডানায় গোলাম মুরশেদ।

গোলাম মুরশেদ সম্পর্কে কোন কথা পাঠককে জানানো হয়নি। সে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ত; কেকার দু'বছরের সিনিয়র। সাক্ষাৎ মোট তিনদিনের। কলেজের নবীন বরণ উৎসবে একদিন, ঘণ্টাখানেক নানান বিষয়ে গল্প হয়েছিল। দ্বিতীয় বার দেখা ঈশ্বরদি স্টেশনে। কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসে রাজশাহী যাবে। একসঙ্গে যাওয়া হলো, স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে খাওয়া হলো।

তৃতীয় সাক্ষাৎ কলেজের গেটে; ছুটতে ছুটতে দশ নম্বরের দিকে যাচ্ছিল কেকা। পি.ডি.-র, মানে পূর্ণেন্দু দেউড়ির ক্লাস। লেট করা মানেই মিস করা। গেটে তাকে আটকায় ওই ছেলে। বলা নেই, কওয়া নেই, দুম করে প্রস্তাব করে বসল, তাকে বিয়ে করবে। সব কথাবার্তা হয়ে গেছে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। সবাই রাজি। কেকার বাবা-মা যদি রাজি না হন, তো কোন অসুবিধে নেই, কেকাকে অপহরণ করা হবে। লোক দেখানো অপহরণ। কেকা নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

আপত্তি করবে না মানে! কেকার মাথায় কিছু ঢুকছে না। তৃতীয় নয়নে সে পি.ডি. স্যারকে দেখতে পায়। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ নেচে নেচে

ছুটে বেড়াচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের ওপর দিয়ে। 'পথ ছাড়েন, ক্লাসে যাব। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'আমাদের...মানে...আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন, আর তুমি বলছ ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

'কী আশ্চর্য! কবে কখন আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা হলো আর কবেই বা আমি রাজি হলাম? ওসব কথা ভাবার সময়ই আসেনি। পি.ডি. স্যার রাগ করবেন, প্লীজ, আমাকে যেতে দেন।'

প্রেমিকের শরীরে রক্ত টগবগ করে ওঠে। হবারই কথা। চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। ইলোপ হচ্ছে। অপহরণ তো রোজ দু'চারটে হয়।

কলেজের গেট থেকে খবরটা চাউর হতে দেরি হয় না। শুধু কেকার বাসায় নয়, কেকার বয়সের সব তরুণীর অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয় কেকার ক্লাস করতে আসা। কেকার মা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান রাজশাহী। বোনের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েন। 'কেকা ক'দিন এখানেই থাক। নইলে আমাদের সবার মুখে চুনকালি পড়বে।'

আবেদার মা অবশ্য খুবই যত্ন নিয়েছেন কেকার। কিন্তু যত্নটা কেকার কাছে বেশির ভাগ সময়েই মনে হয়েছে বাড়াবাড়ি। এক ধরনের বন্দী জীবনে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু করার তো কিছু নেই। নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। শয়তান বেশ ক'দিন জ্বালাতন করল। কেকার কেবলই ওই বাউণ্ডুলে আউট-ল ছেলেটার কথা মনে পড়ে। না হয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল, কিন্তু ওর প্রেম তো কিছু মিথ্যে নয়। গোপনে কয়েকটা চিঠিও লিখে ফেলল কেকা। সেসব দুঃখের দিনে তার পরম বন্ধু আবেদা আপা। তার হাত দিয়ে চিঠি ডাকে দেবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু আবেদার কি আর একটুও আক্কেল নেই? খালাত বোনের

বন্ধুত্বের চেয়ে তার কাছে অনেক বড় মায়ের তর্জনী। আবেদা চিঠিগুলো নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত আর ছিঁড়ে ফেলে দিত।

প্রেমিকেরও করার কিছু ছিল না। প্রথম দিকে ক'দিন কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ফোড়ং-এর মত খুব তড়পাল। তারপর একসময় ফ্রিজে-রাখা পায়েসের মতই ঠাণ্ডা-মিঠে হয়ে গেল। পরের বছর গ্রামের একটি নাদুসনুদুস কিশোরীকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে একদিন বেড়াতে এল কেকাদের বাসায়। কেকার দিকে চোরা, লাজুক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে ধরতে লাগল তার বাবা আর মায়ের হাতে-পায়ে। তার বাড়িতে ওদের সবার নেমন্তন্ন। 'না' বলা চলবে না।

এই ছিল কেকার প্রথম যৌবনের 'ক্র্যাশ'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আরও একটা ছোটখাট কাহিনী ফসকে যাওয়া চুমুকের পানির মত তার জীবনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তা এতই সামান্য যে তার উল্লেখ পাঠককে কেবল বিরক্তই করবে। থাক ও-প্রসঙ্গ।

আমরা ভাসছিলাম কেকার স্বপ্নের মাঝখানে, সেখানে ফিরে যাওয়াই ভাল। কেকা অসহায়ের মত তাকাচ্ছে একবার পাশের যুবকটির দিকে, আর একবার নিচে—অনেক নিচের সফেন তরঙ্গায়িত জলরাশির দিকে। ভাবল, একবার জিজ্ঞেস করে, 'মুরশেদ ভাই, তোমার গোলগাল, সুখী-সুখী বউটি কেমন আছে? কটা ছেলেমেয়ে হলো?'

জিজ্ঞেস করা হলো না, পাখি হঠাৎ তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে নিচের দিকে। মূর্তিমান হয়ে উঠেছে ক্রুদ্ধ, অহঙ্কারী ঢেউ। ডুবে মরবে নাকি ওরা? চোখ বুজে কেঁদে উঠতে গিয়ে কেকা দেখে, গলায় স্বর ফুটছে না।

সহযাত্রী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হাত ধরতে গিয়ে কেকা স্পষ্ট দেখতে পায়, সে-হাত মুরশেদের নয়, ফারুকের। তার অন্য হাতে কেকার অনুরূপা— সেই আইভরির মূর্তি। দুঃখ, অভিমান, কান্না— সব এসে গুঁতোগুঁতি শুরু করেছে তার বুকের ভিতর, গলা ধরে এসেছে।

কথা রাখো

সেই সময় সে বিষম দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল। কোথায় যেন খট্‌খট্‌ শব্দ হচ্ছে। কেউ ঘা দিচ্ছে দরজায়। এই দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে কোত্থেকে এল কাঠের দরজা, কে-ই বা দিচ্ছে আঘাত? স্বপ্ন দেখছে নাকি সে? কোনটা স্বপ্ন? সমুদ্রের ওপর পাখির ডানায় মুরশেদ কিংবা ফারুকের সঙ্গে ওড়া? না দরজার খটখটানি?

দ্বন্দ্বের নিরসন হলো পরের সেকেণ্ডেই। স্বপ্নের পাখি মিলিয়ে গেল অনন্ত নীল বাস্তবে। দরজায় দ্রুত টোকা দিচ্ছে কেউ। ব্যস্ত, ব্যাকুল আঘাত।

কেকা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। প্রথমে ঠিক করে নেয় পরনের কাপড়, তারপর চুল। দরজা খুলে পিছিয়ে আসে এক পা। ফারুক দাঁড়িয়ে আছে। তার চুল উস্কখুস্ক। দুমড়ে-মুচড়ে আছে স্লিপিং স্যুট।

'তুমি! এত রাতে!'

ফারুক কেকার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘোর-লাগা রোগীর মত। ঠিক এই রকম কেকাকে সে আগে কখনও দেখেনি। তার চোখে ঘুম লেগে আছে তখনও। বিষম অসহায় আর আদুরে দেখাচ্ছে তাকে। কপালের ওপর থেকে একগুচ্ছ চুলের সরু ফালি এঁকেবেঁকে এসে ঠোঁটের কোণা দিয়ে ঢুকে পড়েছে মুখের ভিতর। ফারুকের ইচ্ছে হলো আঙুল দিয়ে ঠোঁটের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিতে। বেশ কষ্ট করেই ইচ্ছেটাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে হলো। উপায় নেই।

'কিছু মনে কোরো না, কেকা। স্পেশাল ব্রাঞ্চের লুৎফর রহমান সাহেব এসেছেন তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে।'

'আমাদের সঙ্গে!'

'তোমাদের...মানে...এ-বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে।'

কেকা স্বপ্নে-দেখা দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের স্মৃতিচারণ করে। 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা কী চান তাদের কাছে? আমি চেয়েছিলাম, উনি ড্রইং

রুমে বসে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু উনি...'

অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলেন ছন্দা। 'না, ফারুক। আমরা বরং কেকার ঘরেই বসি। এ-ঘরটা বড়, বসার জায়গা আছে। আবেদা আপার ঘরটা আজেবাজে জিনিসে ভর্তি হয়ে আছে।'

এরপর এগিয়ে এল আবেদা। এইমাত্র মুখে পানি ছিটিয়ে এসেছে সে। ভালভাবে মোছেনি। কাপড়ও ঠিক করে নেয়নি। কেকা তার শাড়ির প্রান্ত টেনে ধরে কিছুটা ভদ্র করতে চেষ্টা করল।

ফারুক চলে গেল। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে এসে পড়লেন গোয়েন্দা। কেকা চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকায়। লোকটা বেঁটে, রোগা। ছেলে-ছোকরাদের মত করে চকরা-বকরা শার্ট গায়ে দিয়েছে। এই লোককে গোয়েন্দা ভাবতে পারা সোজা নয়, বিশেষ করে যে শার্লক হোমস্ আর মাসুদ রানা পড়েছে— এমন কারুর পক্ষে।

হাত জোড় করে মাফ চাইলেন লুৎফর রহমান। 'আমি খুবই দুঃখিত। বড়ই লজ্জিত। বোনদেরকে এই অসময়ে বিরক্ত করা খুব খারাপ কাজ।'

আবেদা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, কি যে বলেন! আমরা একটুও বিরক্ত হইনি। বসেন। না, না, ওখানে না, এখানে বসেন। আপনারও তো খুব কষ্ট হলো এত রাতে আসতে।'

'ডিউটি, আপা, ডিউটি। এর নাম রুজির ধান্দা। চোরের যেমন দিন আর রাত নেই, আমাদেরও তেমনি দিন আর রাত, ঘর আর বার— সব এক।'

কেকা বলল, 'কেন এসেছেন এত রাতে?'

সহজ, স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু তার স্বরের তীক্ষ্ণতা কারুর কান এড়ায় না। লুৎফর রহমান সাহেব ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, আপা। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। কী করব, বলতে পারেন? কত দিক যে সামাল দিতে

হয়! বসেন, আপনারা তিনজন ওই খাটের ওপর বসেন। মুখোমুখি বসে কথা বলতে সুবিধা, তাই না?'

মুখ বাঁকিয়ে হাসল আবেদা। 'তা···যা বলেছেন। এ তো আর পার্কের বেঞ্চে বসে প্রেম করা নয় যে পাশাপাশি বসে···

বিষম অস্থির লাগছে কেকার। মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'থামো, আবেদা আপা। ওনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রহমান সাহেব হাসেন। 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া ছোট আপাটিও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাক গে, যা বলছিলাম।'

এই পর্যন্ত বলেই রহমান সাহেব চুপ করে যান। অসহ্য, ক্লান্তিকর নীরবতা। পথের পাশের কুকুরের মত ঝিমুচ্ছে হেমন্তের হিম-হিম রাত। দূরে হাইওয়ে ধরে একটা ট্রাক চলে গেল গোঁ গোঁ শব্দে। তারপর আবার সব নিঝুম। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর শব্দ। রহমান সাহেব কি বোবা হয়ে গেলেন?

না, মুখ খুললেন রহমান সাহেব। 'আপনাদের নিশ্চয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই, মূর্তিটা কত দামী। আমরা···'

তাঁর কথার ভিতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করলেন আবেদা। 'কি যে বলেন! ফারুক সাহেব সেই কবে থেকে বুকে আগলে বেড়াচ্ছেন ওই মূর্তি।'

কেকা চিমটি না কাটলে আবেদার কথা থামত না।

রহমান সাহেবের ধৈর্য অবশ্য মুরলি কসবার প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংস স্তূপকেও হার মানায়। হেসে বললেন, 'শুধু তা-ই নয়। এটা আমাদের সবার মাথাব্যথার কারণ। পুলিশ বিভাগের তৎপরতার প্রশংসা করতে হয়। গত এক বছরে কয়েক কোটি টাকার মূর্তি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে। পুলিশ সে-ব্যাপারে কিছু করতে পারুক আর না-ই পারুক, ফারুক সাহেবের মূর্তি খুঁজে বার করার কাজে ত্বরিত

ব্যবস্থা নিয়েছে।'

আবার কলরব করে ওঠে আবেদা। 'ও মা, তাই নাকি? পাওয়া গেছে? কার কাছ থেকে উদ্ধার করলেন?'

'না, এখনও ঠিক উদ্ধার করা হয়নি। তবে···ইয়ে···সন্ধান পাওয়া গেছে। পুলিশ কী করেছে, শুনবেন? এলাকার যত এনলিস্টেড মূর্তি পাচারকারীর নাম ছিল আমাদের খাতায়, সবাইকে ধরে জেরা করা হয়েছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, তারা মূর্তি সরায়নি।'

আবেদা বলল, 'তবে কি হাওয়া হয়ে গেল মূর্তিটা?'

রহমান সাহেব হাসলেন। 'না, অমন দামী জিনিসটা হাওয়া হবে কেন? আছে।'

'কোথায় আছে?'

রহমান সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আবেদার দিকে। আবেদা জড়োসড়ো হয়ে পড়ল সে-দৃষ্টির সামনে। 'আপনাদের কাছেই।'

তিন মহিলা একসঙ্গে বিড়বিড় করে উঠল। 'আমাদের কাছে! কী বলছেন?'

'জ্বি, আপা। আপনাদের কাছেই।'

কেকা অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'আপনি···শেষপর্যন্ত আমাদের চোর বানাতে চান?'

'আমি চাই না। কিন্তু আপনারা যদি চুরি করেই থাকেন, আমি কী করব, বলেন তো?'

রাগে কাঁপতে লাগল কেকা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'হা হা হা। প্রমাণ করতে না পারলে আর বলব কেন? এত রাতে শুধু আপনাদের বেডরুমে নাটক করতে আসলে আমার চাকরি থাকবে? আহা, আপনি আবার দাঁড়ালেন কেন? বসেন, বসেন। মূর্তিটা ফারুক

সাহেবের কামরায় ছিল, তাই না?'

কেউ এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না।

লুৎফর রহমান বললেন, 'ওনার ঘরে কে কে ঢুকতে পারেন?'

ছন্দা এতক্ষণ বিশেষ কিছু বলেননি। এঝর বললেন, 'সে-কথা তো সন্ধেবেলা পুলিশ, সাংবাদিক— সবার কাছেই বলেছি। আর কত বলব?'

মুখ থেকে হাসি-হাসি ভাবটা নিভিয়ে দিলেন স্পেশ্‌ল্ ব্রাঞ্চের অফিসার। 'আরও অনেকবার বলবেন। হাজারবার বলবেন। ঘরে বউ-ছেলেমেয়ে রেখে ভোররাতে আমি আপনাদের সঙ্গে মশকরা করতে বসিনি।'

ছন্দার মুখ শুকিয়ে গেল। 'আমি আর ওই···কেকা···এই দু'জনই।'

আবেদা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি কিন্তু কখনও ফারুক ভাইয়ের ঘরে ঢুকিনি। একদিন গিয়েছিলাম···তাও শুধু··· দরজায় দাঁড়িয়ে···'

লুৎফর রহমান আরও চড়া গলায় কাট-ইন করলেন। 'আপনি খুব বেশি কথা বলেন। চুপ করে বসে থাকেন এবার।'

ঘরটা আবার আগের মত নীরব হয়ে গেল। কেকা নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পায়। লাভ···ঢুপ···লাভ···ঢুপ····

'ঠিক গোয়েন্দা কাহিনীর শেষ দৃশ্যের মত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। কিন্তু যা সত্যি তা তো সত্যিই। আপনাদের দু'জনকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। যাক, এবার আপনাদের সুটকেসগুলো এখানে নিয়ে আসেন।'

ছন্দা আঁৎকে উঠলেন। 'আমাদের সুটকেস মানে!'

'বোকার মত কথা বলবেন না। নিজের ব্যক্তিগত জিনিস, টাকা, এসব কোথায় রাখেন?'

'কেন, আলমারিতে। সে-তো সার্চ করা হয়েছে।'

লুৎফর রহমান হাতের আঙুলগুলো চিরুনির মত করে মাথার চুলে

ডুবিয়ে দিলেন। 'জানি। কিন্তু আপনাদের নিজস্ব সুটকেসগুলো কেউ খুলে দেখেনি। দেখেছে?'

কেকা মাথা সোজা করে বলল, 'না। আপনি যদি দেখতে চান, এখনই আমার সুটকেসটা খুলতে পারি।'

'নিশ্চয় পারবেন। চাবি থাকলে সুটকেস খোলা কোন কঠিন কাজ না। কিন্তু সুটকেস খোলার আগে কাজী ফারুক সাহেবকে ডাকা দরকার।'

ছন্দা বিছানা থেকে নামল।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কোন ছল করেই আপনারা এখন কেউ নড়তে পারবেন না। কাজী ফারুককে আমিই ডাকতে পারি।'

'কিন্তু আমার সুটকেস—'

'ফারুক সাহেব আপনার সুটকেস নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন।' গলা চড়িয়ে লুৎফর রহমান ডাক দিলেন, 'ফারুক সাহেব—'

বিষম আরক্ত মুখে ফারুক ছন্দা ভাবীর ছোট সুটকেস নিয়ে ঢুকল। দামী চামড়ার সুটকেস। সালাম সাহেব হংকং থেকে এনে দিয়েছিলেন।

ছন্দা কাঁপা কাঁপা হাতে খুললেন সুটকেস। এক অতি পুরানো লাল শাড়ি আর আণ্ডার গার্মেন্টস বেরুল। ছন্দার বিয়ের শাড়ি। তারপর বেরুল দুটো অ্যালবাম। কয়েকটা বই, কিছু চিঠি আর দলিলপত্র। আর কিছু পাওয়া গেল না।

বিজয়িনীর ঔদ্ধত্যে নিজের সুটকেস টেনে বার করল কেকা। খুলেই নিজে মূর্তির অনুরূপা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সবকিছুর ওপরে শুয়ে আছে আইভরির মূর্তি। কেকার অনুরূপা।

ভোরের আজান হচ্ছে। 'হাইয়া আলাল ফালাহ...হাইয়া আলাল...'

কেকার মনে হলো, এটাও যদি ওই দুঃস্বপ্নের কন্টিনিউয়েশন হত! আহা!

শরীর থেকে ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন লুৎফর রহমান। ফারুকের চোখ থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে মণি। পলক ফেলতে ভুলে গিয়ে সে মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

লুৎফর রহমান বললেন, 'রাত শেষ। নাটকও শেষ। এবার নিশ্চয় আপনাদের আর সন্দেহ নেই, এটা আপনাদের ঘরোয়া সমস্যা! নেন, এবার নিজেরাই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেন। আমি চাই না, পুলিশ কেসটা টেক আপ করুক। আঠারো ঘা সারানোর আগে বডিই পচে যাবে, বুঝেছেন? চলি, আপারা। অনেক বিরক্ত করলাম। ফারুক সাহেব, খোদা হাফেজ।'

তিনটি পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ভোরের আলোয়। লুৎফর রহমান চলে গেলেন। তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর কথা কারুর মনে নেই।

চোদ্দ

আরও একটা দিন কীভাবে চলে গেল, বাড়ির লোকেরা টের পেল না। সকালবেলা সব খবরের কাগজে প্রয়োজনের বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে মূর্তি চুরি যাবার কাহিনী। স্থানীয় দৈনিকগুলোর লীড নিউজ ওটাই। ঢাকার পত্রিকা এসে পৌঁছল বেলা বারোটার দিকে। প্রায় সব কাগজে দু'এক কলাম বেরিয়েছে মূর্তি রহস্য।

বেলা যত বাড়ে তত বাড়ে কৌতূহলী প্রতিবেশী আর

আত্মীয়স্বজনের ভিড়। নানান মুখরোচক খবরও ছড়াল। অনবরত টেলিফোন বাজছে। সবাই জানতে চায়, মূর্তির কোন খবর পাওয়া গেছে কি না। টেলিফোন ছিল ছন্দার রুমে। বিরক্ত হয়ে সেটটা বার করে বারান্দার টেবিলে রাখল। ফারুক সেটা নিজের রুমে নিয়ে গেল একসময়। টেলিফোন সেট ফারুকের রুমেই থাকে। ঢাকা যাবার আগে ছন্দার রুমে শিফ্‌ট্‌ করেছিল। ফিরে এসে বলেছে, 'বিংশ শতাব্দীর ওই নব্য যন্ত্রণা তোমার কাছে থাক।'

টেলিফোন কল রিসিভ করার ব্যাপারে সবার আপত্তি। নাজমা দু'মণ ভারী বস্তা বয়ে বেড়াতে রাজি, কিন্তু টেলিফোন ধরতে তার মহা আপত্তি। সেবার ঢাকা যাবার আগে আইরিন বলেছিল, তার কাজের মেয়েটা ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ি গেছে। ফারুক যদি পারে নাজমাকে যেন ক'দিনের জন্য ওদের ওখানে রেখে আসে। ফারুক আপত্তি করেনি। ঢাকায় বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়ে নাজমা আনন্দে আটখানা। তার বাড়তি লাভ টেলিফোনের যন্ত্রণা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা সম্পর্কে চমৎকার ট্রেনিং। সেটের নিচের অংশে বোতাম ঘুরিয়ে রাখো বামদিকে। ব্যস, আর শোনা যাবে না বাজনা।

নিজের রুমে নিয়ে গিয়ে প্লাগটা সবেমাত্র সকেটে ঢুকিয়েছে, এমন সময় ঝন ঝন করে উঠল টেলিফোন, ফারুক রিসিভার তুলল।

ওপাশে লুৎফর রহমানের গলা। 'কী খবর, কাজী সাহেব?'

'এখনও বুঝতে পারছি না, মটিভ কি। ওই মেয়ের পক্ষে কাজটা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে অন্য কোন রহস্য আছে।'

'জানি না, ভাই। জীবনে রহস্যের কি শেষ আছে? জীবনটাই যেখানে পুরো রহস্য! তা যাক, খবরের কাগজগুলো পড়েছ?'

'জ্বি।'

'সবাই লিখেছে। রক্ষে, কেউ খারাপ কিছু লেখেনি বা ইঙ্গিত

করেনি। তবু তুমি সাবধান থেকো। এখনই কিছু মুখ খোলার দরকার নেই।'

'আচ্ছা, ভাই।'

রিসিভার ক্রেডলে রেখে পিঠের ওপর দু'হাত লক করে পায়চারি শুরু করে ফারুক। অসম্ভব রাগ জন্মাচ্ছে তার শরীরে। কার ওপর এই রাগ, সে জানে না। কেকা এমন একটা কাজ করতে পারে? অসম্ভব। এটা অবশ্যই আবেদার কাজ। আবেদার চালচলনে সন্দেহ করার মত অনেক কিছু আছে। প্রথম থেকে তাকে চোখে চোখে রাখা দরকার ছিল।

দরজার পরদা দুলে উঠল। ফারুক প্রথমে চমকে ওঠে। বাইরের কাউকে এখন নিজের রুমে ঢুকতে দেবে না সে। কেকা এসে ধীরে ধীরে ওর পিছনে দাঁড়ায়। তার নিঃশ্বাসের শব্দ ফারুকের কানে পৌছচ্ছে। কিন্তু কেন নিজেকে এমন দুর্বল মনে হচ্ছে, ফারুক জানে না। ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না সে। কেকার মুখোমুখি হবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এর চেয়ে যদি মূর্তিটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত, মন্দ হত না।

কিন্তু সাসপেক্ট অসমসাহসিনী। ফারুকের মুখোমুখি হতে তার দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। ক্রমেই ফারুকের মধ্যে ধারণাটা বদ্ধমূল হতে শুরু করে।

'ফারুক, তুমিও বিশ্বাস করো, মূর্তিটা আমি সরিয়েছি?'

এর পরও কাপুরুষতা দেখানো লজ্জার কথা। ফারুক ঘুরে দাঁড়াল; হঠাৎ দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'না। আমি জানি, তুমি এ কাজ করতে পারো না।'

কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেকা। এর চেয়ে বড় স্বস্তির অভিজ্ঞতা তার নেই। 'আমিও জানতাম, অন্তত তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে না।'

'কিন্তু মূর্তিটা তোমার ব্যাগে গেল কীভাবে?'

কেকা কেঁদে ফেলল। 'বিশ্বাস করো, আমি জানি না। কিছুই জানি না। হৈবতপুরে যাবার আগেও আমি এ-ঘরে এসেছিলাম। মূর্তিটার দিকে চোখ পড়েছিল। ঠিক জায়গামতই ছিল ওটা।'

'তোমার সুটকেসের চাবি কোথায় ছিল?'

একটু ভাবল কেকা। 'আমার কামরায়। টেবিলের ড্রয়ারে।'

মাথা নিচু করে ভাবতে থাকে ফারুক। 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আজই আসল রহস্য বার করে ফেলব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাজটা আবেদা আপার। তোমার কী মনে হয়?'

'জানি না, ফারুক। এখন মনে হচ্ছে, হতে পারে। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? না-ও তো হতে পারে। অন্য কেউ দায়ী নয়, তারই বা কী প্রমাণ?'

খাপছাড়াভাবে কথা শেষ করল কেকা। তারপর ভারাক্রান্ত মনে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন এক নাটক জমে উঠল আবেদার কামরায়।

'সময় থাকতে অপরাধ স্বীকার করা ভাল, মিসেস হাসান খান।'

আবেদার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। 'কিসের অপরাধ?'

'মূর্তি তো আসলে আপনিই সরিয়েছেন, ঠিক না?'

আবেদা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, 'সবার সামনেই তো লুৎফর রহমান সাহেব প্রমাণ করে গেলেন। আমার ওপর আবার হঠাৎ সন্দেহ হলো কেন?'

ফারুক কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকে আবেদার দিকে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ, লুৎফর রহমান সাহেব আমাদের চারজনের সামনে দেখিয়ে দিলেন, মূর্তিটা কেকার সুটকেসে ছিল। এতে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয় না। আমি খুব ভাল করেই জানি, কেকা মূর্তি চুরি করেনি। কেকা সবসময় আমার ঘরে আসে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। চুরি করা অনেক

সহজ—এমন বেশ কিছু জিনিস ওর সামনে পড়ে থাকে। কখনও কিছু খোয়া যায়নি।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না যে কেকা চুরি করেনি। বরং আমি বলতে চাই, কেকাই সরিয়েছে ওটা। মূর্তিটার সঙ্গে কেকার চেহারার মিল আছে। অন্য কোন জিনিসের ওপর লোভ না থাকলেও ওটার ব্যাপারে তার দুর্বলতা জন্মাতে পারে।'

ফারুক তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'এবং আপনার কোন দুর্বলতা জন্মাতে পারে না?' আপনি প্রত্নতত্ত্ব লাইনের লোক। মূর্তিটার ওপর আপনার লোভ হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই না?'

'আমার লোভ হলে জিনিসটা আমার সুটকেস থেকেই বেরুত।'

ফারুক হাসল। 'বুদ্ধিমতীর মত কথা বলেছেন। কিন্তু একটা কথা ভাবছেন না কেন, আমার বুদ্ধিও একেবারে কাঁচা নয়। মূর্তিটা আপনি সরিয়েছেন এবং নিজের পজেশানে রাখাটা ঠিক হবে না ভেবেই ওর সুটকেসে রেখেছেন।'

'আপনি আসলে কেকার ব্যাপারে...ইয়ে...এত দুর্বল যে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন দোষটা আমার ওপর চাপিয়ে।'

'উলটো বললেন। আপনি আসলে কেকার ওপর এত জেলাস যে ওকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছেন।'

আবেদা খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেষ্টা করল। 'প্রমাণ কী?'

'আপাতত একটা প্রমাণ দিতে পারি। সন্দেহের আওতায় এখানে আরও একজন আছে। ছন্দা ভাবী। আপনি যদি নিজে না-ও করে থাকেন, অপকর্মের জন্য সে-ও দায়ী হতে পারে। পারে না? কিন্তু আপনি তার কথা মুখেও আনছেন না। আপনি ভেবেছেন, চালাকিটা আমি ধরতে পারিনি?'

আবেদা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না রোধ করার চেষ্টা করল।

'ওকে ফাঁসিয়ে আমার লাভ কী?'

ফারুক তীর ছোঁড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'জেলাসি। আপনি নিজে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন। আমি এড়িয়ে গেছি। কেকার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা সবাই জানে। আপনারও অজানা থাকার কথা নয়। স্বাভাবিক ভাবেই আপনি নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছেন। কেকাকে চোর প্রতিপন্ন করতে পারাটাই তো আপনার মস্ত লাভ। ঠিক না?'

আবেদা কিছু বলল না। নীরবে কাঁদতে লাগল। ফারুক বলল, 'অশ্রুর অস্ত্রে আমাকে কাবু করতে পারবেন না, বলে দিচ্ছি। ভাল চান তো সব স্বীকার করে নেন। নইলে আমি পুলিশে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব। দু'জনের বিরুদ্ধেই মামলা হবে। আপনাদের সবার পরিবার আছে, মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম, সব আছে। ভেবে দেখেছেন, ভবিষ্যতে কী হবে?'

'কী স্বীকার করব? আমি তো কিছুই জানি না।'

'কেকা সরাসরিভাবে আপনারই আত্মীয়া, আমাদের কেউ নয়। আপনার সঙ্গে সে এসেছে। সরাসরিভাবে আমাদের অতিথিও সে নয়। তার পজেশানে জিনিসটা পাওয়া গেলেও পুলিশ আপনাকে ছাড়বে না।'

আবেদা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে শুরু করল। ফারুক বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'কাল সকালের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্তে আসা চাই, মিসেস আবেদা খান। চলি।'

একই সময় কেকার কামরায় অন্য এক নাটকের শেষ দৃশ্য চলছে। স্তম্ভিত হয়ে ছন্দা ভাবীর দিকে তাকিয়ে আছে কেকা।

ছন্দা ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর কথার সুরে মিলেমিশে আছে হুমকি আর সাহায্যের বরাভয়। 'তোমাকে সই ডেকেছি, বোন। সব সমস্যার সমাধান এখন তোমার হাতে।'

'বুঝলাম না।'

'বিয়েতে রাজি হয়ে যাও। আমাদের রাজপুত্তুরের জুড়ি দেশে ক'টা

আছে, সুন্দরী? ওকে বিয়ে করলে তুমি পস্তাবে না। মামলা খতম।'

কেকা কেঁদে ফেলল। 'এটা নিষ্ঠুরতা, ভাবী। ব্ল্যাকমেইল। জোর করে আপনারা বিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু ভালবাসা কি আদায় করতে পারবে ফারুক?'

ছন্দা বললেন, 'ভালবাসার কথা আমরা আপাতত ভাবছি না। ভাবছি ফারুকের বিয়ের কথা। বিয়েটা হোক, একটা বাচ্চা হোক, তারপর তোমার যা খুশি কোরো, বাধা দেব না। রাতটা থাকল ভাবার জন্যে। সকালেই উত্তর চাই।'

পনেরো

নাশতার টেবিলে অপেক্ষা করছে আবেদার জন্য। শুধু নাশতা কেন, খাওয়ার যে-কোন বেলায় সবার আগে উপস্থিত হয় সে। আজ সবাই এসেছে, আবেদার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

কালকের দিনটি খুব খারাপ গেছে। ফারুক দৈনিক কল্যাণ পত্রিকাটা টেনে নিয়ে চোখ বোলায়। মূর্তি বিষয়ে কোন খারাপ খবর নেই, তবে ওই বিষয়ে সম্পাদকীয় ছেপেছেন একরামউদ্দৌলা সাহেব। দ্বিতীয় সম্পাদকীয়। প্রথমটি বেজপাড়া বনাম বারান্দিপাড়া রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বিষয়ে। তার মানে মূর্তি চুরি হবার ব্যাপারটা দুই পাড়ার ছেলেদের হানাহানির চেয়েও কম গুরুত্ব পাচ্ছে।

কাল আবেদার সঙ্গে খুবই রূঢ় ব্যবহার করেছে ফারুক। এখন তার মনে হচ্ছে, অতটা না করলেও চলত। খুব সম্ভব সেটা মহিলার প্রতি তার

পুরানো, পুঞ্জীভূত বিরক্তি আর রোষের যোগফল। যাই হোক, এখন তার রাগ পড়ে গেছে। একসঙ্গে নাশতা খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

নাজমা গরম পরাটা আর হাঁসের মাংস ভুনা এনে টেবিলে রাখল। ফারুক বলল, 'আবেদা ম্যাডামকে ডেকেছিস?'

'ডাকতে গিছলাম। উনার দরজা তো বন্ধ।'

'দরজায় ধাক্কা দে।'

নাজমা এক মিনিটের মধ্যে ঘুরে এসে বলল, 'ঘরে কেউ নাই।'

ছন্দা টেবিল থেকে উঠে পড়েন। কেকাও গেল তার পিছন পিছন। আবেদা নেই, একটা চিঠি বিছানার ওপর রেখে চলে গেছে।

'প্রিয় ফারুক সাহেব/ছন্দা ভাবী,

অনেকগুলো দিন আপনাদের চমৎকার আতিথেয়তায় কাটিয়ে গেলাম। কথায় বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। আমার পোড়া কপাল, ভাই, কোনকিছুই ভালয় ভালয় শেষ করতে পারি না। আসল কথা কি জানেন, পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ থাকবেই, যারা অন্য দশজনের মত নয়। কেউ খুব ভাল হিসেবে আলাদা আবার কেউ বেশি খারাপ হিসেবে অন্যের চোখে পড়ে। আমি, ভাই, শেষ দলে পড়ি। আমি মানি, আমার অনেক আচরণ, অনেক অভ্যেস আপনাদের খারাপ লেগেছে, আপনারা বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু কী করব? অভ্যেস কি আর কেউ এই বয়সে পালটাতে পারে?

কিন্তু, ভাই, বিশ্বাস করেন, মূর্তির ব্যাপারে কিছুই আমি জানি না। কেকার ওপর দোষ চাপানোর কোন ইচ্ছেও ছিল না। হয়তো সত্যি সেও নির্দোষ। কিন্তু ওর কথা এখন আর আমার না ভাবলেও চলে। ও তো এখন আপনাদেরই একজন। আপনারাই দেখবেন ওর ভালমন্দ।

একটা অনুরোধ, আমাকে মূর্তি চুরির ঘটনার সঙ্গে

জড়াবেন না। কোনদিন কোন তদন্তেই আমার কিছু হবে না, আমি নিশ্চিত জানি। শুধু শুধু আমি আমার পরিবারসুদ্ধ দুর্নামের ভাগীদার হব। তাই এই অনুরোধ। রিসার্চের কাজটা শেষ করার ইচ্ছে আর নেই, আমি স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছি। ভেবে দেখলাম, যতই হৃদয়হীন আর নির্বিকার হোক, ওর চেয়ে বেশি করে কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। ওই ভাল মানুষটার স্বার্থে আপনারা আমাকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবেন দয়া করে। আপনাদের সবার মঙ্গল হোক। ইতি।

আপনাদেরই আবেদা হাসান খান।'

কারুর আর নাশতা খাওয়া হয়ে উঠল না। ফারুক চিঠিটা ছন্দার হাতে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল। কেকা টানটান শরীরে বসে থাকল আবেদার কামরায়। ছন্দা অন্তত তিনবার চিঠিটা পড়লেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলেন কেকার পাশে। ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত রাখলেন।

'সই, ভয় পাচ্ছ?'

কেকার বিষম কান্না পাচ্ছে। কিন্তু এই স্বার্থপর, ক্রিমিনাল-টাইপ মহিলার সামনে অশ্রু ফেলার কোন মানে হয় না। অশ্রুর দাম নেই?

'না, ভয় পাব কেন? আমি তো আপনাদেরই একজন।'

ছন্দা প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন। তারপর ভাল করে কেকার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সেখানে পরিহাস কিংবা অবজ্ঞার কোন ছায়া নেই। তিনি দুই হাতে কেকার কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন। 'সই, তুমি কি আমার প্রস্তাবে রাজি?'

'নিশ্চয় আপনি তা বুঝতে পারছেন।'

ছন্দা সজোরে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আলিঙ্গন থেকে কোনরকমে মুক্ত হয়ে কেকা বলল, 'একটা কথা আছে, ভাবী।'

'বলো।'

'কথা পাকা হবার আগে আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব আর···আর···একেবারে নিরালায়··· ফারুকের সঙ্গে···'

ছন্দা তাড়াতাড়ি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, সই। আমাদের কোন আপত্তি নেই। তুমি নিজের ঘরে যাও। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

কথা রাখলেন ছন্দা। আধঘণ্টার মধ্যে টেলিফোনে বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলল কেকা। ওদের পাবনার বাসায় টেলিফোন নেই। অন্য এক বাসার মাধ্যমে যোগাযোগ হলো। শর্তের একটা পূরণ হবার পর কেকা ফারুকের মুখোমুখি হয়।

এবার অন্য এক কেকা। ফারুকের সামনে সবুজ শাড়ি, লাল ব্লাউজ পরে এসে বসেছে যে-তরুণী, তাকে সে আগে কখনও দেখেনি। এক রাতের মধ্যে তার বয়স বেড়ে গেছে। অনেক বেশি কম্পোজড্ দেখাচ্ছে তাকে।

ফারুকের অপরাধবোধ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে; মনে হচ্ছে এরকম না হলেই ভাল হত।

'ফারুক, আমি একটা ব্যাপারে খোলাখুলি আলাপ করতে চাই।'

নড়েচড়ে বসল ফারুক। কিছু বলল না, কিন্তু অনেক প্রশ্ন তার চোখে। কেকা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তার কাছে এসেছে। আবেদার মত সেটাও কি নাটকীয় কোন পদক্ষেপ?

'বিয়েতে রাজি আছি আমি।'

কেকা খুব সহজভাবেই উচ্চারণ করেছে কথাটা। বেশির ভাগ বাঙালি নারীর বিয়ে তার জীবনকে নিয়ে ঘটানো একটিমাত্র ঘটনা। যেন এটা শুধু কলেমা নয়, দাম্পত্যের অভ্যেস নয়, এমনকি প্রেম বা কোন নির্দিষ্ট কমিটমেন্ট নয়, জন্ম-মৃত্যুর মত একটি অবধারিত একক ঘটনা, যা

মাত্র একবারই ঘটতে পারে। দ্বিতীয় বিয়ে, দ্বিতীয় সঙ্গী গ্রহণ অনেকের কাছে অপমৃত্যু বা জন্মান্তরের মত আশ্চর্য ঘটনা। নিম্নবিত্ত আর উচ্চবিত্ত—দুই সমাজেই বিয়ে একটা খেলার মত। হরদম হচ্ছে, আবার ভাঙছে। খুব সম্ভব মধ্যবিত্ত সমাজেই বিয়ে ওই রকম জন্ম-মৃত্যুর মর্যাদা পেয়ে থাকে। কিন্তু কেকা যত সহজে তার বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা উচ্চারণ করেছে তত সহজে ফারুকের কানে ঢোকেনি। সন্দেহ হচ্ছে, সে ঠিক শুনেছে কি না।

কেকা আবার বলল, 'এত অবাক হবার কিছু নেই. তুমি বিয়ের আয়োজন করতে পারো। আমি সম্পূর্ণ অসহায়। বাঁচার এই একটা পথই খোলা আছে।'

ফারুক গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি জোর করিনি। কখনও করব না।'

'কিন্তু ছন্দা ভাবী জোর করেছেন। বাধ্য করেছেন আমাকে। ভালভাবে বুঝতে পারছি, আমি যদি রাজি না হই, তিনি আরও বড় কোন ষড়যন্ত্র করবেন।'

'তার মানে···তোমার ধারণা···ছন্দা ভাবী ষড়যন্ত্র করেছে? ও নিজেই চুরি করেছে আইভরির মূর্তি?'

কেকা চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'উনি আইভরি মূর্তির অনুরূপাকে চুরি করতে চেয়েছিলেন। আমি ধরা দিইনি। বাধা হয়ে মূর্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে।'

ফারুককে উত্তেজিত দেখায়। 'অসম্ভব! হতেই পারে না। কোথাও কোন ভুল হচ্ছে। ছন্দা ভাবীকে তুমি চেনো না।'

বলল বটে, কিন্তু ওর মনে তোলপাড় শুরু হয়েছে অনেক আগেই; বলা যায় আবেদার চিঠি পড়ার পর থেকেই। কিন্তু মানুষের মন যা কখনও বিশ্বাস করতে চায় না তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সামনে থাকলেও সে ভাবে—ভুল দেখছে। এক প্রমাণের বিরুদ্ধে হাজার প্রমাণ ভিড় করে

মনে। বিশ্বাস খুব জটিল জিনিস। ফারুক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগল।

কেকা বলল, 'এত ভেবো না, ফারুক। তুমি তো আমাকে চেয়েছিলে।'

'আমি তোমাকে চেয়েছিলাম; এখনও চাই। তুমি আমাকে চাওনি, এখনও চাও না।'

কেকা হাসল, কান্নার মত হাসি। 'তাতে তোমার বিশেষ অসুবিধে হবে না। শুধু যদি একটা শর্ত মেনে নাও—'

'এর ভিতরে আবার শর্ত আসছে কেন?'

'আসবে না কেন? তুমি ভুলে যাচ্ছ, প্রেম-ভালবাসা-বিয়ে, সবই আসলে শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার। সবই আসলে এক একটা এগ্রিমেন্ট। চুক্তি।'

ফারুক স্তম্ভিত হয়ে কেকার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওকে সরল জ্ঞানের একটি সাদাসিধে মেয়ে ভাবাটা উচিত হয়নি, বুঝতে পারে সে। কিন্তু নতুন করে বোঝাবুঝি, জানাজানির আর অবকাশ আছে কি? অনেক দূর গড়িয়ে গেছে পদ্মা-মেঘনার জল।

একটু আগে যা সহজ ছিল, এখন তা অনেক কঠিন।

কেকা বলল, 'ভেবে দেখলাম, বিয়ে নিয়ে তোমার যেমন কল্পনাবিলাস, তেমন বিলাস আমারও আছে। দুটো দুই রকমের। কিন্তু সবাই কি সব বিলাসিতার সামর্থ্য রাখে? তুমি জিতলে, ফারুক। আমি হারলাম। এবার আমরা আগের সবকিছু ভুলে যেতে পারি। পারি না?'

ফারুক এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'শর্তটা এখনও বলোনি।'

'আমাদের বিয়ে হবে, কেননা তোমার-আমার মধ্যে বিয়ে হওয়া-না হওয়া নিয়ে লড়াই চলছিল। আমি হেরে গেছি; তুমি আমাকে জিতে নিচ্ছ। আমি বন্দী। কিন্তু বন্দীরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওনা থাকে।'

'লড়াই না হলে কিংবা তুমি হেরে না গেলেও আমি স্ত্রীর যে-কোন ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে নিতাম।'

কেকা বলল, 'বিয়ের পর আমাদের ঘর হবে, কিন্তু সংসার হবে না।'

ফারুক শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। কথাটার অর্থ সে বোঝেনি, তা নয়। কিন্তু কথার তো অনেক রকম অর্থ হয়। সে ভুল করতে চায় না।

'আর একটু সহজ করে বলবে?'

কেকা দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'নিশ্চয়। বিয়ে তো একটা খেলা না। শর্তটর্ত আগেভাগে পরিষ্কার করে নেয়াই ভাল। ঘর মানে দাম্পত্য; সন্তান। তুমি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আমার সঙ্গ পাবে, বন্ধুত্ব পাবে,সাহায্য পাবে। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানও পাবে— যদি আমাদের কারুর শরীর বিশ্বাসঘাতকতা না করে।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর বাকি জীবন আমার নিজের। তোমার টাকার অভাব নেই; সংসার চালানোর মত লোকবলও আছে। সন্তান মানুষ করতে তোমার অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি তারপর পাবনায় ফিরে যাব। লেখাপড়া শেষ করব। রাজশাহী কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব। সুযোগ পেলে বিদেশেও যেতে পারি। তবে কথা দিচ্ছি, তোমার ওপর আর্থিক বা অন্য কোনরকম চাপ সৃষ্টি করব না। আমি চাকরি করব, ক্যারিয়ার গড়ব। আমার ওই জীবনে তোমার কোন্ অধিকার থাকবে না, প্রভাব বিস্তারের সুযোগও থাকবে না। বন্দীর এই শর্তটুকু যদি মেনে নাও...'

ফারুক ওকে কথা শেষ করতে দিল না। হঠাৎ আঁকড়ে ধরল ওকে। ফারুকের একটি হাত ঘিরে ফেলল কেকার কটিদেশ, অন্য হাত ক্ষমতা দখল করল ওর পিঠ। কেকা বুঝে ওঠার আগেই দেখল, ফারুকের

পেশীবহুল বুকের অরণ্যে নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস খুঁজছে সে।

'আমাকে কথা দিচ্ছ, ফারুক? শর্তের বরখেলাপ করবে না তো?'

ফারুক সুকেশিনীর এলোচুলের অন্ধকারে মুখ গুঁজল। 'কথা দিলাম, তুমি যা দেবে তাই নিয়েই খুশি থাকব।'

কেকা জড়ানো গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'বিজয়ী কি কোন শর্ত আরোপ করতে পারে?'

কেকা ভয়ে ভয়ে ফারুকের মুখের দিকে তাকাল। 'যদি তা আমার শর্তের বিরুদ্ধে না যায়।'

'তুমি··· আমারই থেকো।'

কেকা অধর বাড়িয়ে দিল, তার ভিতর নিজের অধর ডুবিয়ে দিয়ে উত্তর খুঁজে নিল ফারুক।

ষোলো

প্রেমিকা কিংবা স্ত্রী সম্পর্কে যে-স্বপ্নবিলাসই থাক, বিয়ে সম্পর্কে ফারুকের তেমন কোন রোম্যান্টিক কল্পনা ছিল না। বরং বিয়ের অনুষ্ঠানে বাড়তি আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে তার উন্নাসিক মনোভাবের কথা সবাই জানে। বিয়ে তো আসলে নরনারীর মিলনের সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সাদামাঠাভাবে বিয়েটা হয়ে যাওয়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ফারুক। বাড়তি অনুষ্ঠানের মধ্যে ছন্দার জেদাজেদির ফলে

গায়ে-হলুদ হয়েছিল।

আইরিন আর করিম খান ঠিক আগের দিন এসে পৌঁছেছেন। একটা বিদেশী ডেলিগেশন টিম নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলেন করিম শাহনওয়াজ খান। আরও তিনদিন আগে বিদেশী অতিথিদের চলে যাবার কথা; ঢাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর হরতালের কারণে তাদের স্কেজিউল বদলাতে হয়। আইরিন প্রথমে একাই চলে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে ভেবে দেখল, এতে করিম সাহেব একটা ছুঁতো পেয়ে যাবেন এবং শেষপর্যন্ত হয়তো আর আসবেন না। শ্যালক ক্ষুণ্ন হবে? আইরিন তার স্বামীকে হাড়ে হাড়ে চেনে। ঠিক ম্যানিজ করে ফেলবে। 'আর বোলো না, 'মাই ডিয়ার মিস্টিকুটুম, রুজির ধান্দা বড় ধান্দা, বুঝলে? চলো,ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি।' বলেই হয়তো শেরাটন কি সোনারগাঁ হোটেলে মস্ত পার্টি থ্রো করে দেবেন। শালা গলে জল হয়ে যাবে।

যা-ই হোক, বিয়ের আগের দিন পৌঁছলেও আইরিন তার কর্তব্যে ত্রুটি করেনি। 'এটা করেছ, ভাবী?' 'ওটা এখনও হলো না?' 'ভাবী, তুমি কিচ্ছু বোঝো না, আজকাল নিয়ম হচ্ছে...' এইসব বলে মহা শেয়রগোল তুলে দেয় সে। বিয়েতে কোন বিয়ে-বিয়ে লক্ষণ নেই— এতে সে খুবই অসন্তুষ্ট।

ফারুক বলল, 'তোমার বিয়ে তো আচ্ছা ধুমধামসে হয়েছে, আপা। আমার বিয়েতে কী হলো না হলো তা নিয়ে অত মাথাব্যথা কেন?'

করিম শাহনওয়াজ খানও একটু ধুম-ধাড়াক্কার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে শালার পক্ষেই মত দিলেন।

'আমাদের হিরো ঠিকই বলেছে, আইরিন। সত্যি বলতে কি, আজকাল নিয়ম হচ্ছে কুল পাড়ার মত টুপ্ করে কোথাও বিয়েটা পেড়ে ফেলা। তারপর সময়-সুযোগ বুঝে একদিন খানাপিনা।'

'দেখো, ভাল হচ্ছে না। এমনিতেই আমার ভাইটা সন্ন্যাসী হয়ে

যাচ্ছিল। ওকে যত বেশি সামাজিক আর পারিবারিক প্যাচালের সঙ্গে ইনভল্‌ভ্‌ করা যায় ততই ভাল। তুমি কিনা ওর সন্ন্যাসব্রতের তাল দিচ্ছ।'

করিম খান হো হো করে হাসেন। তারপর স্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলেন, 'আমি ওর সন্ন্যাসব্রতের তালে তাল দিচ্ছি? না ওকে বোধিবৃক্ষের তল থেকে টেনে বার করে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়েছি? ছন্দা ভাবীকে ডেকে জিজ্ঞেস করো তো!'

ছন্দা মেহেদি বাটতে বাটতে মিটিমিটি হাসতে লাগল। আইরিন অবাক হয়ে একবার স্বামী আর একবার ছন্দা ভাবীর দিকে তাকায়। 'আসল ব্যাপারটা কী, বলো তো? কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি!'

ছন্দা হলুদ-মেহেদি মাখা হাত আলতো করে ছুঁয়ে দেন ননদের গালে। 'তোমার কর্তার এক কথায় তিন অর্থ হয়, জানো না? বাদ দাও। ছাদের ওপর থেকে একটু ঘুরে এসো। আয়োজন যা-ই হোক, দু'চারজন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা তো আসবে! চেয়ারগুলোও পাতা হয়নি। পরিমল যেন কার কথা বলল। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কই, কারুর সাড়া পাই না।'

আইরিন ছাদের কাজকর্ম ইন্‌স্‌পেকশ্‌ন্‌ করে চলে গেল ভাইয়ের কাছে। 'ব্যাপারটা কী, বলো তো, ফারুক?'

ফারুক প্রথমে তেমন পাত্তা দেয়নি। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ঘোপ থেকে ফিরে। কনেপক্ষের কয়েকজন এসেছে। তাদের থাকার জন্য ওদের ঘোপের বাড়ির দোতলাটা খালি করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন সকালে শোনা গেল, কারা যেন উৎপাত করছে। কেকার বাবা রাগ করে হোটেলে রুম রিজার্ভ করতে ছুটেছেন। গোলমাল মেটানোর জন্য প্রথমে পরিমলকে পাঠানো হয়; সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর যেতে হয়েছে ফারুককেই। অবশেষে ঝামেলার নিষ্পত্তি হয়েছে। ফারুক আইরিনের সন্দেহের কথা শুনে হেসে ফেলল।

'দুলাভাই আবার কী ষড়যন্ত্র করবেন?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন। আবেদা আপাই বা হঠাৎ কাজ ফেলে চলে গেল কেন?'

গায়ে-হলুদ শেষ হয়ে গেল। পায়েস, মিষ্টি আর বাটা হলুদ নিয়ে হইচই চলল কিছুক্ষণ। এরপর সুযোগ পেয়েই করিম শাহনওয়াজ খানকে ধরল ফারুক।

'মাই রেসপেক্টেড বিশ্বকর্মা দুলাভাই, একটা প্রশ্নের উত্তর দেন তো! সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করছি। সিরিয়াসলি উত্তর দেবেন।'

'বাপরে! শুনেই তো ভয় লাগছে, মাই ডিয়ার শ্যালক। বলো দেখি।'

'অসম্ভব ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব করলেন? কোন প্যাঁচ কষেছিলেন?'

করিম শাহনওয়াজ খান একটা বিপদের আঁচ অনুমান করেন। 'আমি ঠিক জানি না···তবে···ছন্দা ভাবীকে জিজ্ঞেস করে দেখো। উনি··· মানে···ওনার একটা প্ল্যান ছিল···আমি শুধু···'

ফারুক ছন্দার ঘরে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা লক করে দেয়। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে পাশের ঘরে। ছন্দা মনে মনে ঘাবড়ে গেলেই মুখের হাসি অবিচল রাখতে চেষ্টা করেন।

'কী হয়েছে, ভাই লক্ষ্মণ?'

'মূর্তিটা তুমিই সরিয়েছিলে, তাই না?'

ছন্দা এই আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলেন অনেক আগেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কোন লক্ষণ ফারুকের দিক থেকে প্রকাশ পায়নি। নিশ্চিন্ত হয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ছন্দা। হঠাৎ ফারুকের এই প্রশ্নে ভেবাচেকা খেলেন।

'আজ তোমার জীবনের একটা শুভদিন। এসব কথা অন্য দিন হবে।'

'ভাবী, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

ছন্দা ফারুকের মুখের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। 'যা করেছি, তোমার ভালর জন্যেই করেছি, ফারুক।'

ফারুক নীরবে কয়েক সেকেণ্ড ছন্দার দিকে তাকিয়ে থাকল। তিনি তখন খুবই ব্যস্ত। শাড়ির আঁচল বারবার আঙুলে জড়িয়ে যাচ্ছে। যত খুলছেন ততই পেঁচিয়ে যাচ্ছে আঁচলটা।

'একটা খারাপ কাজ দিয়ে কোনদিন কারুর ভাল করা যায় না, ভাবী। আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। ভাবতে পারিনি, তোমার হাতে এত নোংরা কাজ হতে পারে।'

ছন্দার চোখ জলে টলমল করছে। 'তোমার জীবনটা যে ছারখার হয়ে যাচ্ছিল। আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া...কী?'

'দুলাভাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি যদি প্যাঁচটা না লাগাতাম তা হলে...উনি...হয়তো...'

'কী করতেন উনি?'

ফারুকের স্বর ক্রমেই রুক্ষ হচ্ছে। ছন্দা সাবধানী মানুষ। নতুন ঝামেলায় জড়ানোর চেয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই ভাল বিবেচনা করলেন।

'থাক ওসব কথা। আমি অন্যায় করেছি। আমাকেই শাস্তি দিয়ো।'

ফারুক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তোমার একটাই শাস্তি পাওনা, ভাবী।'

'বলো, কী শাস্তি দেবে!'

'আমি এই বিয়ে ভেঙে দেব।'

কাজী ফারুককে চেনেন ছন্দা। আঁৎকে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে

গোঙানির মত শব্দ বেরুল। ফারুক দরজার দিকে পা বাড়াতেই আছড়ে পড়লেন ছন্দা। ফারুকের পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন বুকের সঙ্গে।

'পা ছাড়ো, ভাবী।'

ককিয়ে কেঁদে ফেললেন ছন্দা। 'তোমার দোহাই, ফারুক। আমাকে অন্য কোন শাস্তি দাও। বিয়ে ভেঙো না।'

ছন্দা ফারুকের পা ছাড়বেন না। ফারুক কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিল। অনড় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে সে। ছন্দা তার পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। 'ক্ষমা চাই···লক্ষ্মী ভাই, স্বীকার করছি···খুব অন্যায় হয়ে গেছে···তবু···আমাদের সবার কথা ভেবে···'

'ভাবী, তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি ওই আইভরিওয়ালীকে চিনতে পারোনি। আমি চিনতে পেরেছি। তুমি ওকে ব্ল্যাকমেইল করেছ মিথ্যে অভিযোগের ফাঁদে ফেলে। ও আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। ওঠো।'

ছন্দা উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছল। 'তবু তুমি যদি সুখী হও···আর তোমাদের বংশ···কাজী জাহিদ, কাজী ইসমাইলদের এত সাধের গোষ্ঠীর ধারা রক্ষা পায়···তাই ভেবে আমি···মানে আমরা···এই পথ ধরতে বাধ্য হয়েছি।'

ফারুক অবসন্ন শরীরে দরজার কাছ থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

'একবার যদি আমাকে কোন একটা আভাস দিতে···একটা হিন্ট···'

ছন্দা জানালার গ্রিলে মাথা ঠেকান। 'কেকা তোমার সঙ্গে দেখা করে কী যেন বলতে চেয়েছিল।'

'বলেছে। সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।'

'তবু শুনি।'

'আমাদের ঘর হবে, কিন্তু সংসার হবে না।'

ছন্দাকে প্রথমে একটু ভারাক্রান্ত মনে হয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার মুখে আলো ছড়িয়ে পড়ে। 'মন খারাপ কোরো না, ভাই লক্ষ্মণ। প্রথম প্রথম অমন হয়েই থাকে। যেসব বিয়ের গোড়াতে গোলমাল দেখা দেয়, সেসব বিয়েই কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাল হয়, সুখের হয়।'

ফারুক বলল, 'তোমার বিশ্বাসের সবটুকু যদি সত্যি হত, ভাবী!'

'একটুও ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ফারুক একটা পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। 'এভাবে আমি বিয়ের সুখ কেন, স্বর্গও চাই না। না-ই বা হত বিয়ে। ভালবেসে ত্যাগও তো করা যায়, ভাবী। ভালবাসা অনেক বড়। ছোট স্বার্থের বেড়াজালে তাকে আটকানো যায় না, আটকানোর চেষ্টা করতে নেই। হয়তো তাতেই আমি সুখী হতাম।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ফারুক। দরজার পাল্লা ধরে ছন্দা তাকিয়ে থাকল। তারপর ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পাগল!'

বিয়ের আসরে অবশ্য পুরোপুরি পাগলামি করছিল অনন্ত আর তার বন্ধুরা। ঘোপের কয়েক ঘর নারী-পুরুষ তাদের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। করিম খান কাপড় বদলে মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর হাঁকডাকে বিয়েবাড়ির একটা আমেজ তৈরি হয়েছে। আইরিন তিনটে লাউডস্পীকার জোগাড় করে তার দিয়ে সংযুক্ত করেছে ফারুকের রেকর্ড প্লেয়ারের সঙ্গে। তারপর রেকর্ডপ্লেয়ারে চাপিয়েছে বিসমিল্লা খাঁ-র সানাই, রবিশঙ্করের সেতার। পুরো বাড়িটা এক চক্কর ঘুরে ফারুক পুকুরের চাতালে গিয়ে বসল।

স্বপ্নসখির সঙ্গে তার বেশ ক'টা স্বপ্নিল সন্ধ্যা কেটেছে এখানে। শুধু স্বপ্নে যার সঙ্গে প্রেম, তাকে ঠিক প্রেমিকা বলা যায় কি? কিন্তু ওইসব

সিরিয়াস চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দেবার তাগিদ বোধ করল ফারুক। কাল তার বিয়ে। কেকা নামের সেই নারী— স্বপ্নসখি হোক আর প্রিয়াই হোক— স্ত্রী হিসেবে এ-বাড়ি চলে আসবে কাল। তারপর তাঁরা দাম্পত্যের অভিনয় করবে। ভালবাসার অভিনয় করবে। হয়তো কোন বিশেষ রোম্যান্সের মুহূর্তে কেকার মনে পড়ে যাবে এই বিয়ের পিছনের ঘটনা; মুহূর্তের জন্য হলেই মন বিষিয়ে উঠবে। থায় থাকবে তখন দাম্পত্য? কোথায় যাবে অঙ্গীকার? ভালবাসার প্রশ্ন না হয় থাক।

বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায়। এখনও সময় আছে। এক ধরনের উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপতে থাকে তার নাকের পাটা। কী দরকার? উৎসবমুখর বাড়িতে হঠাৎ একটা নাটক হয়ে যাবে— দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারছে না ফারুক।

পরিকল্পনাটা অবশ্য পরদিন বিকেল পর্যন্ত তার মাথায় ঘুরপাক খেল। আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল সে। বিয়েটা ভেঙে দেওয়া যায় না? ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যায় না কনেপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না।

প্রচণ্ড গ্লানি আর অপরাধবোধের মধ্য দিয়ে পরদিন ঘোপের বাড়িতে বিয়েটা হয়ে গেল। বাড়িভর্তি মানুষের সামনে শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ছিল শুভদৃষ্টি। আয়নায় উঁকি দিল একটি টায়রা-ঢাকা অনিন্দ্যসুন্দর মুখ। বিষম চমকে উঠল ফারুক। কেকারই মুখ, কিন্তু সে ঐতিহাসিক মূর্তি নয়। সম্পূর্ণ নতুন একটি মুখ। অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে তার দিকে। ফারুকের মাথার ভিতর ঝিমঝিম করে ওঠে। কেন যেন ওই গানের চরণ মনে পড়ে যায়। 'যা কিছু চেয়েছ তাই যদি পাও…'

সতেরো

চমৎকার বাসর সাজানো হয়েছিল; কিন্তু সে-শয্যা যেমন ছিল তেমনই থাকল, কেউ ছুঁয়ে দেখল না। একই ঘরের ভিতর, একই ছাদের নিচে, একই দেয়ালের আড়ালে তারা কাছাকাছি বসে থাকল সারারাত—খাটের পাশে টিলটিং চেয়ারে ফারুক আর একহাত ব্যবধানে কার্পেটের ওপর কেকা। সত্যিকার ব্যবধান কত যোজন, ওরা কেউ জানে না।

একই সঙ্গে মশা-তাড়ানো ওষুধ, এয়ার ফ্রেশনার আর পারফিউম স্প্রে করা হয়েছে ঘরে। সুবাসে ম' ম' করছে চারদিক। লো ভলিউমে রেকর্ড প্লেয়ার বাজছে। কেন্দ্রে সোনালি-লাল টাইটল্ পিসে প্রাচীন গ্রামোফোনের সামনে মুখ রেখে আপন মনে ঘুরছে প্রভুভক্ত।

'অনেক অরণ্য পার হয়ে···অনেক দুঃখ সয়ে সয়ে...অনেক আলোর দেখা পেলাম···যখন তোমার কাছে এলাম···'

এই গান অবশ্য এই রাতে ওদের মনের কথা হয়ে ওঠেনি। কেউ কারুর কাছে আসতে পারছে না। মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্মৃতি। তিক্ততা। ছন্দা ভাবী আর করিম খান চালাকি করে ওদের মন্ত্রবদ্ধ করেছেন, যুগলবন্দী করতে পারেননি। বিয়ে আর মিলন কি এক কথা?

থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ফারুক উঠে পড়ল। জানালা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'ঘুমোবে না?'

কেকা বলল, 'তুমি ঘুমোও, আমার ঘুম আসছে না।'

ফারুক কিছু বলল না। মেয়েটির সহজ হবার জন্য সময় দরকার।

দস্তুরমত ঝড় বয়ে গেছে তার মনের ওপর দিয়ে। একটা ডিস্ক শেষ হয়ে গেলে রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল ফারুক।

'তোমার কাছে সুমন কল্যাণপুরের রেকর্ড আছে?'

ফারুক বলল, 'এই ঘরে যা-কিছু দেখতে পাচ্ছ, সব এখন থেকে তোমার। কোথায় কি আছে— দেখে নাও।'

কেকা হাসল। 'আমার কিছুই চাই না।'

ফারুককে আরও গম্ভীর দেখায়। 'তুমি হয়তো চাও না। সেটা তোমার ব্যাপার। তেমনি আমি দিতে চাই, আমার ব্যাপার।'

কেকা বলল, 'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'ক্লান্ত বোধ করছি, অস্বীকার করব না। কিন্তু তোমার আগে আমি কী করে ঘুমোব, বলো? তুমি আগে ঘুমোও।'

কেকা জানালার পরদা সরিয়ে দেয়। ক্লান্ত চাঁদের চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। ওর চোখে ঘুম নেই। তার ঘুমোনো দরকার, নইলে সঙ্গী মানুষটাও শয্যা নেবে না। ঘুম না এলেও ঘুমের ভান করা উচিত। কিন্তু ওইখানেই মুশকিল, কেকা ভান বোঝে না, ওই কলাটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারেনি।

প্রথম যৌবনের ক্র্যাশের সেই নায়কটিকে মনে পড়ল। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ ভালই আছে। তবু কি কখনও হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কেকার কথা তার মনে হয়? লজ্জা পায় কেকা। অন্তত আজকের রাতে অন্য কোন পুরুষের কথা ভাবাটা ঘোর অন্যায়।

জানালার সিলটা প্রশস্ত। কি খেয়ালে কেকা সিলের ওপর উঠে বসল। ফারুক এক মনে বই পড়ছে। মুরশেদের সঙ্গে কোথায় যেন তার মিল আছে। অনেক খুঁজে মিল পাওয়া গেল। দু'জনেরই নাকের পাশে— প্রায় একই জায়গায়— তিল আছে। কিন্তু তিলের মিলের চেয়ে

অভ্যেসের অমিলটাই কেকার মনে সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বড় গরমিল।

মুরশেদ তাকে কতখানি ভালবেসেছিল, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কিন্তু সে তাকে চেয়েছিল। আগ্রাসী চাওয়া। ডেসপ্যারিট হয়ে উঠেছিল সে। ফারুক হয়তো অনেক বেশি ভালবাসে, কিন্তু তার চাওয়া পোষ-মানা পাখির মতই।

জানালার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে কেকা ভাবে। এলোমেলো, অর্থহীন ভাবনা। একসময় দেখে, সে কিছুই ভাবছে না, ভাবতে পারছে না। হিমেল হাওয়া আসছে। তার সঙ্গে কখন ঘুম এসে ওকে কাবু করে দেয়, টের পায় না।

তার ঘুম ভেঙে যায় ভোর রাতে। নিজেকে বিছানায়, একরাশ ফুলের মাঝখানে নিজেকে দেখতে পায়। বাসি ফুলের গন্ধ, মশা তাড়ানোর ওষুধ আর পারফিউমের সঙ্গে মিশেছে অপরিচিত শরীরের ঘ্রাণ। রক্তে নতুন ধরনের চাঞ্চল্য অনুভব করে কেকা।

যার শরীরের ঘ্রাণ তার শরীরের নতুন চাওয়ার জন্ম দেয় সে কোথায়? সে বসে আছে পায়ের কাছে। অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। লজ্জা পেয়ে উঠে বসল কেকা।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?'

ফারুক হাসল। ভোরের জোছনার মত ম্লান হাসি।

কেকা কল্পনায় দেখতে পায়, জানালার সিলে তার শরীর ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। ওই পুরুষ তাকে আঁকড়ে ধরেছে সবল হাতে। তারপর তুলে নিয়েছে কোলে। তার বাম হাতে কেকার হেলে-পড়া মাথা, এলোমেলো চুল; ডান হাতে শরীরের সবচেয়ে ভারী অংশের ভার। কেকার হঠাৎ মনে হলো, যদি একবার, শুধু এক মুহূর্তের জন্য ঘুম ভেঙে যেত...

'কী ভাবছ, রূপসী?'

যেন ফারুক নয়, অনেক দূর থেকে, অন্য কোন জগৎ থেকে কথা বলছে কেউ। কেকা চোখের কোণ মুছল। তার শরীরের নিচের অংশ নকশি কাঁথায় ঢাকা। পালকি-বেহারা আর বর-কনের চিত্র-আঁকা অপরূপ নকশি কাঁথা। এটা আগে বিছানায় ছিল না। নিশ্চয় তার শীতের অনুভূতি টের পেয়েছে ফারুক। কাঁথা জোগাড় করে এনে শরীর ঢেকে দিয়েছে।

কেকা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 'তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।'

ফারুক আরও একটু কাছে সরে আসে। 'তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ হয়ে গেছে। কিছু কষ্ট না করলে ঋণ শুধব কীভাবে?'

দূরে কোথাও মোরগ বাগ দিচ্ছে। খুলনা-যশোর হাইওয়েতে ট্রাক চলাচল শুরু হয়েছে। রাতের অন্ধকার কাটেনি।

কেকা ফারুকের কাঁধে মাথা রাখল। 'তুমি...আমার কাছে... কিছুই চাও না?'

ফারুক গাঢ় স্বরে বলল, 'চুক্তি অনুসারে একটি সন্তান চাওয়া বাকি আছে।

ওই স্বর কেকার কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে মর্মের কোন এক গোপন কুঠুরিতে পৌছে যায়। সে যেন এক অশান্ত সাগরের বেলাভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। একের পর এক ঢেউ আসছে, আছড়ে পড়ছে তার চৈতন্যে।

সবাই কিছু একই ভাবে-ভঙ্গিতে চায় না। এক এক জনের চাওয়া এক এক ধরনের। কেকার চোখে ময়ূরকণ্ঠী রাত উদাস হয়ে ওঠে। পাতা ঝরার শব্দে সে ডাক দেয়, 'নাও—'

দেয়া-নেয়া শেষ হলো ভোরের আলো ফোটার পর। কেকা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মানুষটা খারাপ নয়। খুবই সহানুভূতিশীল। সঙ্গিনী কষ্ট পেলে সে-কষ্ট দ্বিগুণ হয়ে তার বুকে বাজে। সঙ্গিনীর আনন্দে অনেক বেশি উল্লসিত হয়। কিন্তু এই খেলা ক'দিনের? ক'দিন পরেই সে চলে

যাবে এই উষ্ণ সঙ্গ আর বন্ধুত্ব ছেড়ে। তাকে যেতেই হবে। আরও বড় তার জীবন। অনেক বেশি তার চাওয়া-পাওয়া। অন্যের তুলনায় সংসারের ফাঁদে পা দিতে হয়েছে। কিন্তু সে বন্দীত্ব বরণ করতে পারে না। তার আছে অনেক বিশাল মুক্ত পৃথিবী। বিস্তীর্ণ নীল আকাশ নতুন প্রভাতে তাকে হাতছানি দেয়।

কয়েকটা দিন নানান রকম ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। সামাজিকতা আর আনুষ্ঠানিকতার সীমা নেই। সবচেয়ে বিরক্তিকর বিড়ম্বনা বিয়ের পোশাকের নামে একগাদা জবড়জং কাপড় আর গহনা পরে সঙের মত দর্শনার্থীদের সামনে গিয়ে বসা। নিজেকে আরও বেশি হাস্যকর মনে হয় যখন বিশেষ বিশেষ মুরুব্বিস্থানীয় আগন্তুকদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় আর সেই ধরাচূড়া সামলে মেঝেতে উবু হয়ে তাঁদের পায়ে হাত ছুঁইয়ে সালাম করতে হয় তাকে। প্রথা খারাপ নয়। কিন্তু প্রথাগুলো কি একটু সহজ করা যায় না? সবচেয়ে হাস্যকর সমস্যা হয় যখন বয়স্ক দর্শনার্থীমাত্রেই তার কদমবুসি আশা করে। সেদিন সন্ধেবেলা খোলাডাঙ্গা থেকে এলেন চারজন অতিথি— কেকার শাশুড়িস্থানীয়া। তাঁদের তিনজনের কেকার পরিচয় করিয়ে দিলেন ছন্দা।

'সই, ইনি তোমার খালা শাশুড়ি, আর উনি হচ্ছেন তাঁর ননদ।'

কেকা তাঁদের পা ছুঁয়ে সালাম করল।

'আর দেখো, ইনি হচ্ছেন আমার এক পরিচিতা, সম্পর্কে নানী হন। খোলাডাঙ্গায় বাড়ি।'

তাঁর পায়ে আঙুল ছোঁয়াল কেকা। এত অতিথি আর আগন্তুক আসছেন দলে দলে যে সবাইকে চিনে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। কেকা সবার দিকে ভালভাবে তাকানোর অবকাশ পাচ্ছে না। তিন মুরুব্বির পায়ে সালাম শেষ করে সে যখন বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছে তখন চতুর্থ

মহিলা এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে মহা ব্যস্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'না, না, থাক, আমাকে সালাম করার দরকার নেই। আমিও তোমার নানীশ্বাশুড়ির মতই। তোমার শ্বাশুড়ি আমাকে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তার আর কী বলব...'

বাধ্য হয়ে আবার বিছানা থেকে নেমে তাঁকে সালাম করল কেকা।

নতুন পরিবেশে নতুন জীবন কেকার। প্রায় সব অভিজ্ঞতাই নতুন। ছন্দা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলেন বাড়ির নতুন বউকে। হয়তো আধিপত্য হারানোর ভয়ও নতুন করে পেয়ে বসে তাকে। সংসারে অপকর্মের পরামর্শ দেবার লোকের অভাব হয় না।

কেউ কেউ বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ, ছন্দা? ওই একফোঁটা মেয়ে কী বোঝে সংসারের? বিশেষ করে এত বড় বাড়ি আর সম্পত্তি...'

'ভাবী, নিজের জিনিসটুকু কিন্তু নিজেকেই সামলাতে হবে, বুঝতে পেরেছেন তো? নইলে দেখবেন, একদিন পথে উঠেছেন।'

'আপা, আপনার কাছে ফারুকের কি কম কৃতজ্ঞতা? আপনি তো সব স্বার্থ ত্যাগ করে ওর সংসার সামলেছেন এতদিন। বউ আসতে না আসতেই নিশ্চয় নিজের কপাল নিজে পোড়াবেন না আপনি!'

ছন্দা অবশ্য যথেষ্ট সাবধানী। তিনি জানেন, মুখ ফুটে নিজের কথাটি উচ্চারণ না করেও কীভাবে স্বার্থ রক্ষা করতে হয়। তবে এটা ঠিক, ফারুকের জন্য তাঁর আজকাল খুবই কষ্ট হয়। বেচারা বউয়ের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবু সে বউয়ের মন পায় না। ভালই হয়েছে একদিক থেকে, ভাবেন ছন্দা।

ফারুক আজকাল বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটায়। ব্যবসার অবস্থা ভাল নয়। অনেক কাজ নতুন করে শুরু হচ্ছে। কোন কোন পুরানো ব্যবসা গুটিয়ে দিতে হচ্ছে। বেশির ভাগ ব্যবসা আজকাল মাস্তানতন্ত্রের

আশ্রয়ে মুখ লুকিয়ে আছে। বাইরে যা ছিটেফোঁটা আছে, সেগুলি নিয়ে মান-ইজ্জত বজায় রেখে চলা কঠিন হয়ে উঠেছে।

একটু একটু করে ব্যবসা সরিয়ে ঢাকার দিকে এগুতে লাগল ফারুক। বড় শহরে তবু কিছুটা স্বাধীনতা আছে। বাড়তি সুবিধে: করিম শাহনওয়াজ খানের প্রটেকশন। মাস তিনেক পর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে যশোরে ফারুককে আর পাওয়াই যায় না। বেশির ভাগ সময় ঢাকায় থাকে, কদাচিৎ যশোরে।

ব্যবসার বাইরে ফারুকের কাজ মাত্র একটা: কেকার সুখ-সুবিধের দিকে লক্ষ রাখা। মা-বাবার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে চায় কেকা। ফারুক নিজে ওকে সঙ্গে নিয়ে পাবনা গেল। সঙ্গে নিল গাড়িভর্তি উপহার।

বাপের বাড়ির আত্মীয়-প্রতিবেশী মহলে কেকার বিয়ের ঘটনা সিনড্রেলা কাহিনীর চেয়েও আকর্ষক, ঈর্ষণীয়। কেকা হাসিতে মুখ ভরিয়ে দু'হাতে উপহার বিলি-বন্টন করে, তারপর নির্জন শয্যায় ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

জানুয়ারি মাস না পেরোতেই কেকা টের পেল, সে অন্তঃসত্ত্বা। তার শরীরের ভিতর মোচড়ামুচড়ি করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে আর একটি শরীর। নতুন ধরনের কষ্টের পাশাপাশি তার চেয়ে বেশি স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে তার মনে। চুক্তি পালনের কাজ শেষ হয়ে আসছে।

হয়তো আর এক বছর। পেট থেকে নতুন মানবদেহের মুক্তির পর নিজেও মুক্তি নেবে সে। অনন্ত সমুদ্রে অন্তত ক্ষীণ তীর চোখে পড়ছে। সে একবার চাঁদপুর যাচ্ছিল, স্টীমারে। ছেলেবেলার কথা। বাবা-মা ছিলেন সঙ্গে। ভরা বর্ষায় মেঘনার রূপ যে দেখেনি তাকে বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না। পদ্মা আর মেঘনার মিলনস্থল সমুদ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর

রূপ নিয়েছে। ঢেউয়ের হিংস্র সৌন্দর্যের কাছে অসহায় মনে হয় বাষ্পচালিত স্টীমার। কেকা মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে, কখন মিলবে তীরের দেখা। স্টীমার চলছে তো চলছেই। পথ আর ফুরোয় না। তারপর একসময় উৎকণ্ঠার অবসান হয়। সরু শ্যামল তীর তার চোখে পড়ে। চাঁদপুর কাছেই, আর ভয় নেই।

কিন্তু জীবন মোহনার সুদূর পারে যে-দ্বীপ দেখা যায়, তা কি সত্যি অভয় দিতে পারে? কেকা অপেক্ষায় থাকল।

আঠারো

কেকার ছেলে না মেয়ে হলো— এই প্রশ্নে পাঠকের কৌতূহল থাকতে পারে। কিন্তু আমরা এই উত্তর দেব না। কেকা তো আগেই বলে রেখেছে, ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, এক সন্তানই যথেষ্ট। সন্তানের বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কী চাই? ছেলে না মেয়ে?' ফারুক বলেছে, 'ছেলে হলে ভাল হয় আর মেয়ে হলে খারাপ হয় না।'

ওদের এই কথার পর আর আমাদের পছন্দাপছন্দের মূল্য না দেওয়াই উচিত। সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, ভাল আছে। ছন্দা ভাবীর ঘরের লাগোয়া একটা ঘর তার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল ভূমিষ্ঠ হবার দু'মাস আগেই। ছন্দা সব রকমের সতর্কতা পালন করেছেন। কেকার নিয়মিত মেডিক্যল চেক আপ আর তার সারাদিনের

সবরকমের সাহায্যের জন্য তিনি সদা প্রস্তুত।

রাতের বেলার জন্য দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে ফারুক। সেই বাসর রাতের মানুষটি কেকার কাছে একই রকম থেকে গেছে। কেকা প্রায়ই সবিস্ময়ে ভাবে, যে প্রতিদান চায় না, শুধু দিয়েই তৃপ্ত থাকে, সে কি মানুষ? ফারুকের অনেকগুলো রাত কেটেছে ঘুম ছাড়াই। কোন কোন রাতে সামান্য ঘুমিয়েছে। কেকা ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার একতরফা সেবায়, স্বার্থত্যাগে। কৃতজ্ঞচিত্তে সেবা গ্রহণ করেছে সে; প্রতিদান দেবার কথা ভাবতে হয়নি।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বাড়িতে আবার উৎসবের আমেজ এসেছে। আবার ভীড়াক্রান্ত হয়েছে বাড়ি। মিষ্টি, সুখাদ্য আর উপহারের ছড়াছড়ি চলেছে কয়েক দিন। ফারুক এই উৎসব-উল্লাসের মধ্যে মিশে থেকেছে; তবু কেকা লক্ষ করেছে নির্বিকারত্বের দুর্ভেদ্য বর্ম দিয়ে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সে। কেকার ইনভল্‌ভ্‌মেন্টও একই রকম। সবকিছুতেই সে আছে, আবার কোথাও নেই। সবসময়ই তার মনে হয়েছে, স্বামী-সন্তান-সংসার-সম্পদ-সুখ-উল্লাস-উৎসব, সবই মায়া। দু'দির পর চলে যাবে সে অন্য জীবনে। নিজের মনের মত তৈরি করে নেবে পৃথক ভুবন। এখন যেখানে আছে সেখানকার কেউ নয় সে। যা করছে, সে তার কাজ নয়।

কেকার মা-বাবা এলেন। শিশুকে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোঝালেন কেকাকে। 'অবুঝ হয়ো না, মা। জীবন যেমনভাবে তোমাকে গ্রহণ করে, তেমনভাবেই তাকে মেনে নিতে চেষ্টা করো।'

কেকা সব বুঝল, কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরিকল্পনা ছাড়ল না। শিশুর বয়স যখন ছ'মাস, সে বিদায় চাইল। ফারুক প্রস্তুত ছিল। সে কখনও আশা করেনি, স্বামী কিংবা সন্তানের টান তাকে

সংসারে আটকে রাখতে পারবে। কিন্তু ছন্দা সত্যি নিরাশ হলেন। তিনি বড় গলায় বলেছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিক হয় না, কোনভাবেই না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। হয়তো তা আসলে বিশ্ববিদ্যালয় নয়, সবুজ চত্বরও নয়, তাকে হাতছানি দেয় অন্য এক জীবন। বর্তমান জীবনকে সে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছিল অন্য দশটা সমস্যা ধামাচাপা দেবার জন্য। বারবার তার মনে হয়েছে, এ জীবন তার নয়। তার জীবন পড়ে আছে অন্য কোনখানে। কোথায় , সে জানে না।

ফারুকের টাকাও সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিজের সঞ্চয়ের কিছু টাকা ছিল। বাবা কিছু টাকা দিয়েছিলেন, মা-ও গোপনে যখন যা পেরেছেন, 'পাগলি মেয়েটার' হাতে তুলে দিয়েছেন। তার ধারণা হয়েছিল, জীবনে সঙ্কল্প আর লক্ষ্যটাই আসল। টাকা কোন সমস্যা নয়।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার মাসখানেক পরেই বুঝল, আসলে সে তার গত দেড় বছরের 'বিকল্প জীবনেই' অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বিলাসিতা তো অনেক টাকার ব্যাপার, কোনরকমে স্বাভাবিক জীবনের হাল ধরে থাকতে হলেও নিয়মিত টাকা দরকার। টাকার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বাচ্ছন্দ্যের নয়, মর্যাদার।

কেকা সবকিছুর সঙ্গে আপোস করতে পারে, মর্যাদার সঙ্গে আপোস করা খুব কঠিন। বিশেষ করে একজন বিবাহিতা মহিলার জন্য টাকা কতখানি দরকার, বোঝার জন্য তাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। সেবার হঠাৎ হাত খালি হয়ে গেল মাসের মাঝামাঝি। মেস্-এর টাকা বাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয়নি। কয়েকটা বইয়ের অভাবে খুব ভুগতে হচ্ছে। দিশেহারা হয়ে সে চিঠি লিখল বাবার কাছে।

বাবা তাঁর অন্য তিনটি পড়ুয়া ছেলেমেয়ে নিয়ে মোটামুটি কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কেকার চিঠি পেয়ে অসীম হতাশায় হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখলেন না বেচারা। কেকা প্রত্যেক ভিজিটিং আওয়ারে তীর্থের কাকের মত বসে থাকে বাবার অপেক্ষায়। বাবা আসেন না। চিঠির উত্তর এল বেশ কয়েকদিন পর। বাবা আপাতত আসতে পারছেন না।

যখন সে নিজেই পাবনায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তার নামে একটা স্লিপ এল মেইন গেট থেকে। ভিজিটরের নাম লেখা ছিল না। আবেদা আর তার মা দু'দিন আগেই এসে দেখা করে গেছেন। হাসান সাহেবও একদিন এসেছিলেন। আজ ওঁদের আসার প্রশ্নই ওঠে না।

তড়িঘড়ি করে নিচে নেমে কেকা বিষম অবাক। তার স্বামী দেবু গেস্টরুমে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে সবজান্তার হাসি, হাতে বাবার কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি দরকারি জিনিসের বিপুল সম্ভার।

'কেমন আছ?'

'ভাল। তোমরা?'

ফারুক হাসল। কেকার প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'ছোট পুতুলটা কেমন আছে?'

বাচ্চার নাম রাখা হয়নি। যে যা-খুশি বলে ডাকছে। কেকা জানে, কাজী বাড়ির সন্তানের নাম রাখার অধিকার শুধু বাবারই। খুব সম্ভব বিপরীত দিক থেকে ওই রকম চিন্তা চলছে ফারুকের মাথায়। মা-ই রাখুক বাচ্চার নামটা।

ফারুক মাথা দুলিয়ে বলল, 'ভাল।'

গেস্টরুমের বারান্দায় কেকার কৌতূহলী বান্ধবী আর রুমমেটদের উঁকিঝুঁকি চলছে। তারা খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাচ্ছে সুদর্শন, সুবেশ

স্বামীটির দিকে। ওদের ধারণা হয়েছিল, কেকার বিয়ে হয়েছে একটি সাধারণ দরিদ্র পরিবারে। তাদের জটলা ক্রমেই বাড়ছে, ফিসফিসানিরও শেষ নাই।

'সেজেগুজে বেরুচ্ছিলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, পাবনা যাব।'

ফারুক বিদায় নেবার জন্য তৈরি হলো। হিপ পকেট থেকে মানি পার্স বার করে বলল, 'কিছু টাকা রাখো।'

'থাক না...' দ্বিধায় জড়ানো স্বরে কথাটা টানা রইল। ফারুক পাঁচশো টাকার দশটা নোট বার করে গুঁজে দিল ওর হাতে। এই টাকা জোর করে ফিরিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু পরিস্থিতি মানুষকে নিয়ে মাঝে মাঝে কি হাসি-ঠাট্টাই না করে! কেকা নিজের অজান্তে টাকাগুলো তুলে রাখল তার হাতব্যাগে, আর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'এখনই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। একটা ট্রেন আছে এগারোটায়। ধরতে হবে।'

ফারুকের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে খুব বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেকা। কিসের আশায় ওই মানুষটা এভাবে জীবনপাত করছে, সে ভেবে পায় না। কত মাশুল দিতে চায় একটা অন্যায়ের জন্য? তবু যদি সে-অন্যায় তার নিজের হত! ও কি যিশু খ্রিস্ট? অন্যের পাপের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হতে চায়?

এর পরের দুটো মাস স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে কাটল। নিঃসঙ্গতার কষ্ট ছিল; কিন্তু সেটা আমল দিচ্ছিল না কেকা। সামনে টিউটরিয়াল পরীক্ষা। অনেক কষ্টে নোট সংগ্রহ করে, লাইব্রেরি থেকে রেফারেন্স বই এনে পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে কেকা। এমন সময় একটা ছোট ঘটনা ঘটল,

যা ওই মুহূর্তে কেকার নিঃসঙ্গ মনে উপপ্লব ঘটিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

লাইব্রেরির কাছে সেরে ফিরছে কেকা, গেটে ঢোকার ঠিক আগে একটা পরিচিত স্বর শুনে ফিরে তাকাল।

'কিন্তু মনে করবেন না, আপনি কি···মিস কেকা শাহীন?'

কেকার মনে হলো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক গভীর গর্তে পড়ে গেছে সে। এরকম একটা সাক্ষাৎকারের কথা সে কখনও ভাবেনি। মুরশেদ আগের চেয়ে বেশ মোটা হয়েছে, কিন্তু দেখতে খারাপ লাগছে না। মুখে বাড়তি সুখ আর তৃপ্তির ছাপ।

কয়েকবার ঢোক গিলতে হলো, একটু ঘামতেও হলো, কিন্তু অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল কেকা। 'ঠিকই ধরেছ, কিন্তু নামের আগে "মিস" জুড়ে দেবার আর দরকার নেই।'

মুরশেদ তার চিরাচরিত অভ্যেস অনুযায়ী মহা শোরগোল তুলে কথা বলতে শুরু করে। 'আরে, কী আশ্চর্য! একেই বলতে হয় সৌভাগ্য। তোমার সঙ্গে···এখানে···এভাবে দেখা হয়ে যাবে, জীবনেও ভাবিনি।'

'সত্যি, আমিও ভাবিনি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ইল-এ। আমি তো এখানকারই রেসিডেন্ট।'

মুরশেদ অবাক হয়। 'তবে যে বললে···বিয়ে হয়ে গেছে···নাকি, আমারই ভুল হলো?'

'তোমার ভুল হয়নি। বিয়ে হয়েছে। বাচ্চা হয়েছে। তাই বলে পড়াশোনা শেষ করতে পারব না কেন?'

'ও, তাও তো ঠিক।'

কেকা বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

'আমি মাস্টারি করি কেকা। টাউনে। সিটি কলেজে। বাসা নিয়েছি

ঘোড়ামারায়···ওই যে···পোস্ট অফিস আছে না··· আচ্ছা, বাসার কথা থাক। আমার বউ আবার তোমার নাম শুনলেই আঁৎকে ওঠে। তার ধারণা···আমাদের মধ্যে···ইয়ে··· থাকগে ওসব কথা।'

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। সূর্যের ঔদার্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলতে জ্বলতে তপ্ত বালু উড়িয়ে দিচ্ছে পদ্মা। যুগ যুগ ধরে বছরের এই সময় নদীটা মরুভূমি হয়ে যায়।

'ভালই হলো। মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আজ চলি, কেমন?'

'না' বলার উপায় ছিল না। দু'জনেই তাতানো রোদে ঘামছিল কিন্তু হল-এ ফিরে আসার পর থেকেই কেকা লক্ষ করে, সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। এ-ও বুঝল, মুরশেদের সঙ্গে আবার দেখা না হলে অস্থিরতা কাটবে না।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারে মুরশেদ বেগম রোকেয়া হল-এর গেটে এল, চতুর্থবারে কেকা গেল রাজশাহী টাউনে— সিটি কলেজ খুঁজে বার করে দেখা করল মুরশেদের সঙ্গে। সেদিন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, পদ্মার পারে গিয়ে বসল দু'জন। দু'জনেরই অনেক কথা জমে আছে অন্যকে বলার জন্য। কেকা আগের দুই সাক্ষাৎকারে পরিষ্কারভাবেই সে-আভাস দিয়েছে মুরশেদ। কেকা তার গল্পের ঝাঁপি খুলে ধরে। তার ধারণা ছিল, কেকা নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে শুনে মুরশেদের মনে নতুন করে রং ধরবে।

মুরশেদ অনেক বদলে গেছে এই ক'বছরে। একসময় সে লাইনের পর লাইন কবিতা আওড়াত; স্বপ্নের কথা বলত; শিল্প নিয়ে মাথা ঘামাত। এখন সে জীবনের অশ্লীল দিকগুলোর মধ্যে শিল্প খুঁজে পায়, তার স্বপ্ন দড়িখড়বোনা এলাকায় একটি সরকারি প্লট আর বাড়ি তৈরি করার জন্য

ব্যাঙ্ক লোন। আর কবিতা? ওই প্রসঙ্গ উঠতেই বিশ্রী শব্দে হেসে উঠে সে বলল, 'দেশে কবি আর ছাগলের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।'

তবু মুরশেদের সঙ্গ খুব বেশি খারাপ লাগছে না কেকার। সে ভাবতে চেষ্টা করে, নিজেও তো বদলে গেছে। মুরশেদ কি চাইলেই কিছু আগের সেই শাহীনকে খুঁজে পাবে?

মুরশেদকে একটা কথা বলবে সে আজ; তিনদিন ধরে পরিকল্পনা করছে। কিন্তু তার জন্য আরও রোম্যান্টিক পরিবেশ চাই। কেকা একটু আগে তাকে নোটিশও দিয়েছে। 'একটা বিশেষ কথা আছে। একটু পরে বলব।' মুরশেদ হেসেছে, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি।

সন্ধ্যা হচ্ছে। সূর্য ছুটি নিয়েছে আজকের মত। ছিমছাম আকাশে উঠি উঠি করছে একটি-দু'টি তারা। সময় এসেছে। কেকা দুরুদুরু বুকে শুরু করতে গেল, 'আচ্ছা, মুরশেদ—'

মুরশেদও 'আচ্ছা, আজ ওঠা যাক' বলে দ্রুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের ধুলোবালি ঝাড়ল। 'সন্ধে হয়ে গেছে। আমার বউ তো আজ আবার একচোট নেবে।'

আহত স্বরে কেকা বলল, 'আমার কথা ছিল।'

'আর একদিন শুনব। না, এক কাজ করো, সংক্ষেপে বলো।'

কেকা উঠে দাঁড়াল। ভাঙা হাসি হাসল।

'কী হলো, বললে না?'

'থাক।'

রাস্তায় উঠে এসে রিকশা ডাকল কেকা। তাকে অনেকটা পথ একা যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অন্তত চারমাইল দূরে। রিকশা রওনা হবার আগে মুরশেদ আবার বলল, 'রাগ করলে, শাহীন?'

'তোমার ওপর রাগ করব কেন?'

রিকশা ছেড়ে দিল। মুরশেদ চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি সেই আগের মত পাগলি থেকে গেলে। পরশুদিন তোমার হল-এ যাব, কেমন?'

কেকা তার দিকে ফিরে তাকাল না।

বিষন্ন অবসন্ন শরীরে সে হল-এ ঢোকে। নতুন জীবনটাকে নতুন করে অসহ্য মনে হয়। রুমে ঢুকেই একটা চিঠি পেল বিছানার ওপর রুমমেট নাতাশা লিখে রেখে গেছে।

'প্রিয় শাহীন,

বোনের বাসা থেকে জরুরী তলব এসেছে, তাই চলে যাচ্ছি। কাল সকালে সরাসরি ক্লাসে যাব, দুপুরে ফিরব। ও, হ্যাঁ, আজ তোমার দেরি দেখে খুব ভয় পাচ্ছিলাম। দুলাভাই, মানে তোমার বর এসেছিলেন। তুমি মুরশেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছ শুনে আর দাঁড়াননি, চলে গেছেন। তোমার বাচ্চাটা অসুস্থ। খুব কান্নাকাটি করছে। তাই উনি আজই রাত দশটার গাড়িতে যশোর চলে যাবেন। শুভেচ্ছান্তে, নাতাশা।'

বিছানায় শুয়ে ক্লান্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করল কেকা। একটি শিশুর মুখ তাকে হল্ট করতে থাকে। রাজশাহী থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে শিশুটি। কাছে মা নেই, বাবা নেই। আত্মীয়-স্বজন আছে, ওকে খাওয়ানোর লোকের অভাব নেই। কিন্তু মানুষের জীবন কি শুধু ওইটুকু পেয়ে তুষ্ট? আরও একটি বিব্রত, ব্যথিত মুখ কেকার অন্তরে রক্তপাত শুরু করে দেয়। অধ্যাবসায়ী মুখ। সদয় মুখ। দায়িত্ববান মুখ।

এরপর সিদ্ধান্ত নিতে কেকা আর দেরি করে না। খুব সম্ভব জীবনে এই সিদ্ধান্ত সে সবচেয়ে কম সময়ে নিয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সুটকেস গোছানোর কাজ শেষ হলো। টেবিলে খাবার ঢাকা আছে।

খাবে? ঘড়ি দেখল কেকা। সাড়ে আটটা বাজে। খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। খাবারটা সে ভরে নিল খালি আইসক্রিম বাক্সে। প্লাস্টিকের বোতলে পানি নিল। ক্ষিপ্র হাতে একটা চিঠি লিখল তানিয়াকে। সেটা ওর চিঠির জায়গায় রেখে ব্যাগ-সুটকেস তুলে বেরিয়ে এল। দরজা লক করে চলে গেল প্রভোস্টের রুমে। অসময়ে হল থেকে বেরুতে হলে বিশেষ অনুমতির দরকার হয়। পিওনকে পাঠিয়ে প্রভোস্টের অনুমতি নিয়ে আসতে গেল আরও পনেরো মিনিট।

এত রাতে রিকশা পাওয়া কঠিন। মতিহার চত্বরে প্রথমে যে-রিকশা পাওয়া গেল, সে তালাইমারি পর্যন্ত যাবে। তা-ই সই। তালাইমারি পৌঁছে বাস পেল কেকা। সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছে গেল আলুপট্টি বাসস্ট্যাণ্ডে। আবার রিকশা। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে সে যখন প্ল্যাটফরমে পৌঁছল, তখন আর দেরি নেই; সবুজ বাতি দুলিয়ে দিয়েছেন গার্ড।

উনিশ

ফারুক আগে ভেবেছিল, স্টেশনে পৌঁছনোর আগেই রাতের খাও. সেরে নেবে রহমানিয়া হোটেলে। পুরো শহরে এই একটা রেস্তোরাঁ খাবারই তার পছন্দ হয়। কিন্তু সন্ধেবেলা কেকার হোস্টেল থেকে ফেরার সময় তার খাওয়ার ইচ্ছে উবে গেল। একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য

মনে মনে চাঞ্চল্য বোধ করে সে।

কেকাকে মুক্তি দেওয়া যায় না? আর কেন এই পাহাড়ের গায়ে ঘুঁসি মারা? ভরা গ্রীষ্মে যতই জোর করা হোক, দক্ষিণের বাতাস উত্তরে ফেরানো যাবে? অনেক চেষ্টা করেছে সে। ছন্দা ভাবীর মত সে-ও ভেবেছিল, সব ঠিক হয়ে যাবে। সন্তানের মায়া যাকে বেঁধে রাখতে পারেনি, তার কাছ থেকে সংসার আশা করা নিরেট মূর্খতা।

ফারুক একটু আগে মতিহার থেকে ফিরেছে তার হোটেলে। হোটেল মুন। রাজশাহীতে এলে সে এখানেই ওঠে। সঙ্গে মালপত্র বলতে শুধু একটা ব্রিফকেস। সেটা গুছিয়ে রেখে চুপচাপ ভাবতে বসল সে। কী করা যায়? একটা চিঠি লিখে কেকাকে ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিলেই তো হয়! কেকা মুক্তি পেয়ে যাবে।

দু'তিনবার চেষ্টার পর চিঠি লেখার পরিকল্পনা বাতিল করল ফারুক। না, কেমন একটা নাটকীয়তা এসে যাচ্ছে ব্যাপারটায়। সে বরং যশোরে ফিরে যাবে। আরও দু'একদিন ভাববে, তারপর সিদ্ধান্ত নিবে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ চা খেলো সে। হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে বিল শোধ করল। তারপর ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা নিতে ইচ্ছে করছে না। হাঁটতেই ভাল লাগছে বরং।

সিল্ক ফ্যাক্টরির সামনে আসতেই ফারুক দেখল, আকাশ জোছনায় হেসে উঠেছে। দীর্ঘদেহী গাছগুলোর আড়াল থেকে ডালপালা মুখে নিয়ে উঠে আসছে চাঁদ। ভারি সুন্দর চাঁদ। ফারুকের মন ভাল হয়ে যায়। সে যে মুহূর্তের আবেগের মাথায় কেকাকে চিঠিটা লিখে ফেলেনি সেজন্য নিজেকে অভিনন্দিত করল। 'দেখো, ফারুক, পৃথিবীটা কত সুন্দর। একটি চাঁদ কেমন মায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে। মন খারাপ কোরো না। হয়তো ছন্দা ভাবীই ঠিক বলেছেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটু

ধৈর্য ধরলে কী হয়? ...কেকা, তোমার আইভরিওয়ালী, প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে গেছে? যাক না! ও তো জীবনটা বদলে দেখতে চেয়েছে। ও তো কোন ছলনা করেনি তোমার সঙ্গে। প্রতারণা করেনি। ...পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জল এতদিনে অনেক গড়িয়ে গেছে। চাপা পড়ে গেছে পুরানো প্রেম।...যায়নি? যদি না গিয়ে থাকে তবে এই জোছনা, এই মধুর আকাশ, এই নিটোল রাত...সবই তো ওদের! তুমি কেন দুঃখ করবে?

কখন সে স্টেশনে পৌছেছে, টিকিট কিনে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে জানালার ধারে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে, জানে না। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি শুনেছে, অপেক্ষা করছে কখন চলতে শুরু করবে। একটু একটু করে দূরে চলে যাবে কেকার কাছ থেকে।

এমন সময় দরজায় ক্লান্তির শ্বাস তার হৃৎপিণ্ডে চমক দেয়। এই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে পরিচিত। ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে দেয়, টেনে নেয় কেকার সুটকেস, ব্যাগ, আইসক্রিমের বাক্স আর পানির বোতল।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারুর চোখে পলক পড়ে না। কেউ কোন কথা বলে না। না বলুক, আমরা জানি, ওরা কি বলতে পারে। আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি ওরা কী ভাবতে পারে। ফারুক ভাবছিল, 'সূর্যের তপস্যা কি আনিবে না দিন?' আর কেকা? অনেক উঁচু পাহাড়ের দুর্গম পথ পার হয়ে সে প্রতীতী পেয়েছে: অবুঝ বয়সের উন্মত্ত আবেগ যেমন ভালবাসা নয়, তেমনি শুধু কল্পলোকের রোম্যান্সও প্রেম নয়। প্রেম-ভালবাসা ওগুলো ছাড়িয়ে অনেক বড়। পাহাড়র চেয়ে দীর্ঘ, সমুদ্রের চেয়ে গভীর। সেখানে মায়া আছে, স্নেহ আছে. দায়িত্ববোধ আর অঙ্গীকার আছে। তপস্যা আছে. আর আছে স্বার্থত্যাগ।

পাঠককে একটি পরামর্শ দিতে চেয়েছিলাম। গভীর রাতে নির্জন নিঃশব্দ নিসর্গে চাঁদ দেখতে যাবেন। কেন দিয়েছিলাম? ওই রকম জোছনার সাগরে সাঁতার কাটলে মন ভাল হয়ে যায়, মনের কালিমা দূর হয়ে যায়। সত্যিকার জোছনা খুঁজে পাবেন, আর খুঁজে পাবেন নিজেকেও। ট্রেন যখন আব্দুলপুর জংশনে অনেকক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিল, তখন ওরা জানালায় পরস্পরের গালে গাল ঠেকিয়ে তাকিয়ে ছিল চাঁদের দিকে। ওদের মনের সব পঙ্কিলতা, সব হাহাকার দূর হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর ফারুক জিজ্ঞেস করেছে, 'কবে ফিরে আসবে?'

কেকা তার বুকে মুখ লুকিয়ে জড়ানো গলায় বলেছে, 'আর ফিরব না।'

'পড়াশোনা?'

কেকা ওই মুহূর্তে উত্তর দেয়নি। কখন দিয়েছে, জানেন? যখন যশোরে পৌঁছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এগোতে এগোতে পাকা দালানগুলো ফুরিয়ে গেছে, ফাউণ্ড্রির গা ঘেঁসে এগিয়ে গেছে কিশোরীর চুলের অবহেলিত লাল ফিতের মত লাল খোয়ার পথ ধরে, পৌঁছে গেছে আর্চওয়ের কাছে, শুনতে পেয়েছে অসুস্থ শিশুর কান্না, তখন।

'ওই যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়, ওই যে ঘণ্টা বাজে!'

*****

পারেন।

এরপর আর ঝামেলা পোহানোর মানে হয় না। ফারুক স্বাধীনতার আশা ছেড়ে দিয়ে বোন-দুলাভাইয়ের অধীনতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। লাভ হয়েছে দুটো। টাকার অপচয় বন্ধ হয়েছে, ভাল খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি যত্নটা ফাউ।

করিম শাহনওয়াজ খান একদিন ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, 'এরপরও যদি, শালা, তোমার এখানে অসুবিধে হয়, বলো কী করতে পারি। লোককে গার্লফ্রেণ্ড জুটিয়ে দেয়া আমার জন্যে একটুও কঠিন না। কিন্তু তোমার আপার চোখ দিয়ে যখন আগুনের হলকা ছুটবে, নাকের ছিদ্র বড় হয়ে যাবে, তখন...'

ফারুক তাড়াতাড়ি বলেছে, 'মাফ চাই, মাই রেসপেক্টেড বিশ্বকর্মা দুলাভাই। গার্লফ্রেণ্ডের দরকার নেই। আপনার মত ওয়েল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ফ্রেণ্ড থাকলেই জীবন ধন্য বলে মেনে নেব।'

খান সাহেব হো হো হেসেছেন, কিন্তু ছেড়ে দেননি। 'বয়স কত হলো তোমার? আইরিনের তো উনত্রিশ। তার মানে তোমার নিশ্চয় পঁচিশ বা ছাব্বিশ!'

'জ্বি না, সাতাশ।'

'ওই হলো। সাতাশ। এরই মধ্যে এঞ্জিন অকেজো করে ফেলেছ? আস্ত নারী অফার করছি, আর তুমি কিনা সিটিয়ে যাচ্ছ!'

ফারুক হেসে সারা। 'সত্যি কথা বলি, দুলাভাই, কাউকে মনে ধরে না।'

'মনে ধরে না মানে! সাড়ে ছ কোটি নারী আছে দেশে। ক'জনকে দেখেছ, শালা? ঢাকা শহরেই আছে চল্লিশ লাখ। অন্তত বারো লাখ কুমারী।'

'দুলাভাই, ওদের কেউই সেই রমণীর মত না। আমি তো দেখিনি।'

'সত্যি কথাটা বলি, কেকা। এই চেহারার মূর্তির সঙ্গেই প্রথম দেখা হয়েছিল। সে-চেহারার মানবীর সঙ্গে দেখা হলো এই সেদিন।'

কেকা বলল, 'তার মানে···আপনি আসলে মূর্তির প্রেমে পড়েছেন। আমাকে আপনি···কখনও ভালবাসতে পারবেন না।'

'যাহ, হেঁয়ালি করছ। মানুষ মূর্তিকে পছন্দ করতে পারে। কিন্তু ভাল বাসতে হলে তার চাই রক্তমাংসের মানুষ। যেমন আমি··· তোমাকে···'

কেকা চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ফারুকের দিকে ফিরে তাকায়। তখন হঠাৎ ফারুকের মনে হয়, সম্বোধনে একটা ভুল হয়ে গেছে।

'রাগ করলেন, কেকা? ভুলে "তুমি" বলে ফেলেছি। আইভরির মূর্তিটাই আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। মনে মনে ওর সঙ্গে কথা বলি। তুমি সম্বোধনে।'

কেকা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পুকুরপাড়ে ঝোপের ভিতর অন্ধকারে ওর শরীরের সঙ্গে শরীর মিলিয়ে এক রাজপুত্তুর বসে আছে। যে-কোন স্বাভাবিক সাধারণ মেয়ের স্বপ্নের পুরুষ। কেকা নিজের রক্ত নদীর ফুঁসে ওঠা জোয়ারে ভাসতে ভাসতে টের পায়, জীবনে প্রেম আসছে। কিন্তু এ কেমন প্রেম?

রাজপুত্তুরের প্রেমের কথা সে কখনও ভাবেনি। সে স্বপ্নবিলাসী নয়। তার চেয়ে বড় কথা, সে কল্পনা করেছিল, সমস্ত শরীর-মন-প্রাণ নিয়ে দুর্দান্ত দুর্বিনীত সাইক্লোনের মত ভালবাসা আসবে জীবনে। ওর সব কূল ভাসিয়ে নেবে। এক সাধারণ পরিবারের সাধারণ তরুণ হবে তার প্রেম। নিজের জীবনের সব ঔজ্জ্বল্য আর উচ্ছ্বাস প্রেয়সীর হৃদয় কোটরে জমা রেখে ফুরিয়ে যাবে সে, হারিয়ে যাবে। আর সে প্রেমিক তরুণকে ভরিয়ে দেবে অসাধারণ এক ভালবাসা দিয়ে। কোথায় সেই স্বপ্নের ভালবাসা? প্রেম আসছে। বিকল্প পথে, বিকল্প বাহনে। সোজা পথে রিকশা চড়ে যেতে যেতে যদি সামনে বড় রকমের যানজট দেখে,

ডুবিয়ে দিলেন। 'জানি। কিন্তু আপনাদের নিজস্ব সুটকেসগুলো কেউ খুলে দেখেনি। দেখেছে?'

কেকা মাথা সোজা করে বলল, 'না। আপনি যদি দেখতে চান, এখনই আমার সুটকেসটা খুলতে পারি।'

'নিশ্চয় পারবেন। চাবি থাকলে সুটকেস খোলা কোন কঠিন কাজ না। কিন্তু সুটকেস খোলার আগে কাজী ফারুক সাহেবকে ডাকা দরকার।'

ছন্দা বিছানা থেকে নামল।

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কোন ছল করেই আপনারা এখন কেউ নড়তে পারবেন না। কাজী ফারুককে আমিই ডাকতে পারি।'

'কিন্তু আমার সুটকেস—'

'ফারুক সাহেব আপনার সুটকেস নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন।' গলা চড়িয়ে লুৎফর রহমান ডাক দিলেন, 'ফারুক সাহেব—'

বিষম আরক্ত মুখে ফারুক ছন্দা ভাবীর ছোট সুটকেস নিয়ে ঢুকল। দামী চামড়ার সুটকেস। সালাম সাহেব হংকং থেকে এনে দিয়েছিলেন।

ছন্দা কাঁপা কাঁপা হাতে খুললেন সুটকেস। এক অতি পুরানো লাল শাড়ি আর আণ্ডার গার্মেন্টস বেরুল। ছন্দার বিয়ের শাড়ি। তারপর বেরুল দুটো অ্যালবাম। কয়েকটা ব্রা, কিছু চিঠি আর দলিলপত্র। আর কিছু পাওয়া গেল না।

বিজয়িনীর ঔদ্ধত্যে নিজের সুটকেস টেনে বার করল কেকা। খুলেই নিজে মূর্তির অনুরূপা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সবকিছুর ওপরে শুয়ে আছে আইভরির মূর্তি। কেকার অনুরূপা।

ভোরের আজান হচ্ছে। 'হাইয়া আলাল ফালাহ···হাইয়া আলাল···'

কেকার মনে হলো, এটাও যদি ওই দুঃস্বপ্নের কন্টিনিউয়েশন হত! আহা!